হে সৈনিক তোল নিশান

বীরেন দাশ



১৬, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক—শেফালিকা ঘোষ

ভারত বুক এজেন্সি

৬ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মূল্য—তিন টাকা

প্রথম সংস্করণ : স্বাধীনতা দিবস—১৩৫৫

প্রিণ্টার—রসিক লাল পান

গোবর্দ্ধন প্রেস

২০৯, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

'হে সৈনিক তোল নিশান' ঐতিহাসিক উপন্যাস এ-কথা বলাই বাহুল্য। বঙ্গ-ভঙ্গ অন্দোলন থেকে সুরু করে আইনঅমান্য আন্দোলন পর্য্যন্ত, বিপ্লবীবাংলার এই সুদীর্ঘকালের পটভূমিকায় কাহিনীটি রচিত। যেসব বন্ধু বান্ধব, পরিচিত অপরিচিত ও ঐতিহাসিক চরিত্রের জীবনী থেকে এর উপাদান সংগ্রহ করেছি, তাঁদের কাছে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। স্বাধীনতা যুদ্ধের যে-সব শহীদ আজ আর বেঁচে নেই, শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁদের স্মরণ করছি বার বার। স্বাধীন ভারতের নর-নারীরা চিরকাল তাঁদের পূজো করবে। সেই সব সর্ব্বত্যাগী দেশ সেবক ও দেশসেবিকাদের অন্তত ক'জনের কথা পাঠকদের কাছে বলবার সুযোগ পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করছি।

বীরেন দাশ

৩৫।১এ, বাদুর বাগান ষ্ট্রীট
কলিকাতা

বীরেন দাশ প্রণীত

(উপন্যাস)

ম্যাট্রপলিস

নতুন পাঠশালা

(ছোটগল্প)

সবুজ নিশান

(প্রবন্ধ)

সাহিত্যে বিপ্লব

চলচ্চিত্র

(চলচ্চিত্র সম্বন্ধে অপূর্ব্ব গ্রন্থ)

(জীবনী)

জোসেফ ষ্টালিন

(ছোটদের)

খেলাঘর

রুমমেট

লক্ষ্মী ও দস্যি মেয়েদের গল্প

আকাশ জয়ের গল্প

ইত্যাদি

রথীন সেন

প্রীতিভাজনেষু

বুনিয়াদী শিক্ষার পটভূমিকা রচিত

অভিনব উপন্যাস

বীরেন দাশের

নতুন পাঠশালা

"মনে রেখাপাতা করে। জাতিগঠনে এ ধরণের উপন্যাসের বিশেষ সার্থকতা আছে।" **আনন্দবাজার**

"বাংলা সাহিত্যের মর্যাদাই শুধু রক্ষা করিবে না, জাতি গঠনের কাজেও অশেষ সাহায্য করিবে।" **যুগান্তর**

"This purposeful novel will be thoroughly enjoyed by all." **Amrita Bazar.**

"This is an outstanding contribution in recent years." **Hindusthan Standard.**

বীরেন দাশের লেখা সম্বন্ধে

আনন্দবাজার: প্রগতিবাদী শক্তিশালী আধুনিক তরুণলেখকদের মধ্যে বীরেন দাশ অন্যতম। গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, জীবনী ও শিশু-সাহিত্য রচনা করিয়া তিনি খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন।

যুগান্তর: উদীয়মান লেখকদের অন্যতম বীরেন দাশের একটী নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী আছে।

অমৃত বাজার: Biren Dass is a promising author.

হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড: He has got a forceful pen.

মালঞ্চ: বীরেন সুলেখক। সাহিত্যিকের রচনাশৈলী থাকায় তাঁর গ্রন্থগুলো সুখপাঠ্য।

চৌদ্দই আগষ্ট উনিশ শ সাতচল্লিশ রাত বারোটা। শঙ্খঘণ্টা আর জয়ধ্বনির ভেতর মহানগরী জেগে উঠল। দু'শ বছরের পরাধীনতার ঘুম গেল টুটে। দীপমালায় সজ্জিত নগরী; ঘরে ঘরে জাতীয় পতাকা উচ্ছল হাওয়ায় থর থর কাঁপে। এ যেন জনতার আনন্দ-কম্পিত হৃদয়েরই প্রতীক।

দুশ বছরের পরাধীনতা আজ শেষ হল। দাসত্বের লৌহশৃঙ্খল ভেঙে পড়ল। তাই মূক নগরী মাঝরাতে মুখর হয়ে উঠেছে। উৎসবমত্ত জনতার জয়োল্লাসে আকাশ বাতাস মুখরিত। আতসবাজি ফুটছে চারদিকে।

সদ্যমুক্ত রাজবন্দী শ্যামল, আলো নিবিয়ে দিয়ে দোতলার ঘরের এক কোণে খাটিয়ায় শুয়ে আছে। পাশের বাড়ীর ছাদ থেকে একফালি রূপালি আলো এসে পড়েছে ঘরের ভেতর।

শ্যামলের পুরাণো চাকর বৈকণ্ঠ ঘরে ঢুকে বললে, দাদাবাবু, ছাদে এসে ছাখো, আমাদের নিশান কেমন উড়ছে!

শ্যামল খুসীর স্বরে বললে, তুইও নিশান কিনেছিস?

বৈকুণ্ঠ বললে, তুমি বল কি দাদাবাবু! আজকের দিনে নিশান তুলব না?

সায় দিয়ে শ্যামল বললে, সত্যিই ত। আজ ঘরে ঘরে নিশান তোলার দিন।

বৈকুণ্ঠ বলতে লাগল, নগদ আটটা টাকা দিয়ে ঐ নিশানখানি আনলাম।

আট টাকা? শ্যামল বললে; বলিস কি, এত দাম!

বৈকুণ্ঠ বললে, আট টাকা শুনে তুমি হয়ত ভাবছ, বৈকুণ্ঠ বড্ড বেশী খরচ করে। সামনে ঐ যে মাড়োয়ারীবাড়া, জান দাদাবাবু, তারা তিনখানি নিশান কিনেছে, প্রত্যেকখানির দাম দেড়শ টাকা!

বাইরে কোথায় আতস বাজী ফুটছে। বৈকুণ্ঠ বলতে লাগল, আর জান, দাদাবাবু, ওরা হাজার টাকার বাজী পোড়াবে আজ।

হাজার টাকা! হাজার টাকার বাজী পোড়া'না এমন আর বেশী কি। দেশ স্বাধীন হ'ল, বড়লোকেরা দু'পয়সা খরচ করে আমোদ আহ্লাদ করবে না ত কে করবে? দোতলার বারান্দায় বেরিয়ে আসে শ্যামল। রেলিংএ ভর দিয়ে সে দাঁড়ায়। রাত সাড়ে বারোটায় অগণিত জনস্রোত রাস্তা দিয়ে চলেছে। স্ত্রী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ, ধনী-দরিদ্র; মুক্তির হাওয়া লেগেছে ওদের গায়ে। দু'শ বছরের দাসত্ব-শৃঙ্খল আজ ভেঙ্গে পড়ল। জয় হিন্দ! বন্দেমাতরম!

বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারে না শ্যামল। পা দু'খানি কাঁপছে। স্বাস্থ্য ওর ভেঙ্গে পড়েছে, হয়ত চিরকালের মত। শ্যামল ঘরে ফিরে আসছিল, পাশের বাড়ীর ছাদ থেকে স্ত্রীকণ্ঠে কে তার নাম ধরে ডাকল, শ্যামল বাবু! ফিরে তাকাল সে। ছাদে দাঁড়িয়ে জনৈক মধ্যবয়স্কা ভদ্রমহিলা। একমুহূর্ত্ত শ্যামল মহিলাটির দিকে তাকিয়ে থাকে। কবে কোথায় ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল শ্যামলের মনে পড়ে না।

আমায় চিনতে পারলেন না? ভদ্রমহিলা বললে, আমি মিসেস পাকড়াশী। পাকড়াশী! তড়িতস্পৃষ্টের মত শ্যামল সোজা হয়ে দাঁড়ায়। আগষ্ট আন্দোলনের সময় সি-আই-ডি ইন্সপেক্টার পাকড়াশী তাদের দলবল শুদ্ধ ধরিয়ে দেয়। দীর্ঘ চার বছর পর, শ্যামল আজ জেল থেকে মুক্তি পেয়েছে। মিসেস পাকড়াশী এককালে উজ্জ্বলার বন্ধু ও 'ঘরকন্না ক্লাবের' সভ্যা ছিল। আন্তরিকতার আতিশয্যে রেলিংএর উপর ঝুকে পড়ে গলা বাড়িয়ে মিসেস পাকড়াশী বলতে লাগল, জানেন শ্যামলবাবু, সামনের পার্কে মিষ্টার

পাকড়াশী নিশান তুলছেন কাল। ওঁর তেমন ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু অফিসের সবাই চেপে ধরেছে, ওঁকেই নিশান তুলতে হবে। লেকচারও নাকি দিতে হবে।

সে ত খুবই আনন্দের কথা। শ্যামল নির্লিপ্তস্বরে বললে।

মিসেস পাকড়াশী বললে: আপনাকেও আমাদের সঙ্গে আসতে হবে শ্যামল বাবু!

আমি? শ্যামল বললে: কিন্তু আমার আর কি দরকার মিসেস পাকড়াশী! তা ছাড়া, শরীর ও আমার ভাল নেই।

মিসেস পাকড়াশী বললে, হলই বা শরীর খারাপ। এমন দিন ত আর জীবনে দুবার আসে না, শ্যামল বাবু। না না, আপনাকে আসতেই হবে।

শ্যামল অস্পষ্ট কি একটা বলে ঘরে ফিরে এল।

আজকের নিশানোৎসব,—ধনী-নির্ধন, উৎপীড়িত উৎপীড়ক, আজকের নিশানোৎসবে বুঝি সবারই সমান অধিকার। বৃটিশের ধ্বজাধারী, এতকাল যারা স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধান শত্রু ছিল, এমন কোন অত্যাচার,—এমন কোন কাজ নেই বিদেশী প্রভুর তুষ্টির জন্য যা এরা করেনি; অর্থও খেতাবের লোভে নিজের প্রতিবেশী, আত্মীয় ও বন্ধু—এমন কি পরম আপনজনকেও বৃটিশের হাতে ধরিয়ে দিতে দ্বিধা করেনি; দেশের স্বাধীনতাসংগ্রাম পিছিয়ে দেবার জন্য যারা আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল;—আজকের উৎসবে তাদেরও অধিকার কিছু কম নয়!

পাটিয়ায় বসে শ্যামল একটা বিড়ি ধরাল। বৈকুণ্ঠ এসে বললে, শরীর তোমার ভাল নেই দাদাবাবু, তুমি বরং ঘুমিয়ে পড়। আমি মিছিলে যাই।

নীচে রাস্তায় একদল উৎসবমত্ত জনতা ঢাক-ঢোল বাজিয়ে এগিয়ে চলেছে। জয়হিন্দ, বন্দেমাতরম। বৈকুণ্ঠ রাস্তায় নেমে তাদের দলে যোগ দিল।

পাশের বাড়ীর ছাদে জাতীয়-পতাকা হাওয়ায় উড়ছে। শ্যামল জানালা দিয়ে দেখে। বৃটিশ ও ইয়াঙ্কি সৈন্যের পরিত্যক্ত প্যারাশুট সিল্কের তৈরী নিশান।

খবরটা বৈকুণ্ঠের মুখেই শোনা। প্যারাসুট-সিল্কের নিশান বলেই অত চকমক করছে! বৈকুণ্ঠ বলেছিল। কিন্তু বৈকুণ্ঠ ও-নিশান স্পর্শ ও করেনি। আজকের দিনে মিলিটারীর পরিত্যক্ত সিল্কে তৈরী নিশান উড়াতে সে ঘৃণাবোধ করে। সিল্কের পতাকা হোক আপত্তি নেই। কিন্তু দিশী সিল্কের কি কিছু অভাব?

ছাদে দাঁড়িয়ে মিসেস পাকড়াশী ও বাড়ীর অন্যান্য সব গুলজার করছে। মিষ্টার পাকড়াশীও বুঝি যোগ দিল।

—আমাদের 'ফ্ল্যাগ' যেমন উড়ছে, অমনটি আর কারো উড়ছে না। মিসেস পাকড়াশীর গলা।

—কে hoist করেছে দেখতে হবে ত! সম্ভবত মিষ্টার পাকড়াশীর গলা।

পাকড়াশী ও আজ জাতীয় পতাকা নিয়ে গর্ব্ব করছে! যে পতাকা উড়ানোর অপরাধে সে শত শত কর্মীদের ব্রিটিশের যূপকাষ্ঠে বলি দিয়েছে; জাতীয় পতাকা,—সত্যাগ্রহীদের হাত থেকে যা কেড়ে নেওয়ার জন্য পাকড়াশীরা শত শত শোভাযাত্রীর হাত মুচড়ে ভেঙে দিয়েছে, মাথা ফাটিয়ে চৌচির করেছে, যা নিশ্চিহ্ন করবার জন্য সে আপ্রাণ চেষ্টা করেছে, আজ কিনা নিজের হাতেই পাকড়াশী সেই পতাকা উত্তোলন করল! পৃথিবীতে এমন অঘটন ও ঘটে!

না, শ্যামলের কোন অভিযোগ নেই। এমন কি পাকড়াশীদের বিরুদ্ধে ও তার কোন অভিযোগ নেই। আজকার উৎসবে সবার অধিকার। কারা প্রাচীর ভেঙে পড়েছে। ওয়ার্ডার কি আনন্দ করবে না? .....

তবু তাদের কথাই আজ বার বার মনে পড়ে শ্যামলের। যারা নিঃশেষে, অকাতরে স্বাধীনতার যুদ্ধে নিজেদের বলি দিয়ে গেছে; কোন প্রতিদান চায়নি। আত্মীয়, বন্ধু, পরিবার, পরিজন, রাজপথে দশজনের সাথে চলার অধিকার, স্বচ্ছন্দ-জীবন যাত্রা; দেশের স্বাধীনতার জন্য তারা সবকিছু ছেড়েছিল। অনশনে অর্দ্ধাশনে, রোগক্লিষ্ট দেহ নিয়ে তারা রাতদিন কাজ

করেছে। চোখে ছিল তাদের স্বপ্ন, দেশ মাতৃকার বন্ধন মুক্তির স্বপ্ন। অবশেষে আজ সৈনিকের স্বপ্ন সার্থক হয়েছে।

আজ সেই স্মরণীয় দিন। আজকার নিশানোৎসবে জনতা ও সুবিধাবাদীদের ভীড়ে শহীদদের কথা মনে পড়ে বারে বার।

বাইরে জয়ধ্বনি উঠছে। জয়হিন্দ, বন্দেমাতরম। আজকার এই উৎসবে শেফালির কথা বিশেষ করে মনে পড়ে শ্যামলের। ছোট মেয়ে শেফালি, নিজের জীবন দিয়ে এ-পতাকার সম্মান রক্ষা করেছিল।......

পনের বছর! শ্যামল নিঃশ্বাস ছাড়ল। আজ পনের বছর, শেফালি আর বেঁচে নেই। পনের বছর আগেকার এক স্বাধীনতা দিবসের কথা। গ্রামের মেয়ে শেফালি সাম্রাজ্যবাদের বেয়নেটের সামনে নিশান উঁচু করে দাঁড়াবার সাহস কোথায় পেয়েছিল সেদিন?

দুই

খাটিয়ায় শুয়ে শুয়ে শ্যামল পেছনে ফিরে তাকায়। বিস্মৃতির অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া কথা, গান, গল্প, খুটিনাটি ইতিহাস, সহকর্মীদের কত মধুর স্মৃতি মনের আনাচে-কানাচে আজ ঘুরে বেড়ায়। জলে জাগা ঢেউএর মত ঘটনাপ্রবাহ ক্ষণস্থায়ী, একটার চাপে পূর্ব্বগামী ম্লান হয়ে আসে, মুছে যায়। ছোট বেলার অনেক ঘটনাই শ্যামলের মনে পড়ে না। এককালে মনে পড়ত, আজ আর মনে পড়ে না। মার মুখখানি মনের চোখে কিন্তু আজো অম্লান। মাতৃত্বের অপূর্ব্ব কারুণ্য দিয়ে গড়া সে-মুখে অহঙ্কারের ছিটে ফোঁটাও বুঝি ছিল না। আট বছর বয়সে শ্যামল মাকে হারিয়েছিল। আজ সে পঞ্চাশের কোঠায় দাঁড়িয়ে!

শ্যামলের বাবা কৃষ্ণকান্তি, সেই সব মুষ্টিমেয় লোকেরই একজন ছিল, যাঁরা নিজের প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের জোরে সমাজে প্রতিষ্ঠাবান হয়। কৃষ্ণকান্তি জন্মেছিল সোনাপুর গ্রামে দরিদ্র পিতামাতার ঘরে। অল্প বয়সেই বাপমাকে

হারিয়ে কৃষ্ণকান্তি অনাথ হয়েছিল। সোনাপুর গ্রামের সম্পন্ন চাষী কুঞ্জবিহারী তাকে মানুষ করে।

স্বদেশীযুগের কথা। বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনে সারা বাংলাদেশ মেতে উঠেছে। আদর্শবাদী যুবক কৃষ্ণকান্তি বাইরের দিকে ফিরে তাকাল। কৃষ্ণকান্তির প্র্যাক্‌টিস ভাল ছিল। এত ভাল ছিল যে, অন্য কারো পক্ষে, সব ছেড়েছুড়ে স্বদেশী আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়া কঠিন হত কিন্তু অর্থের প্রতি কৃষ্ণকান্তির মোহ ছিল না। বাইরে দুর্য্যোগ ঘন হয়ে নামছে। সার্সি বন্ধ করে নাক ডাকিয়ে নিদ্রা যাবার এই কি সময়? একদিন বারলাইব্রেরী থেকে ফিরে এসে কৃষ্ণকান্তি মিনতিকে নিজের ভবিষ্যত কর্ম্মপন্থা সম্বন্ধে ইঙ্গিত দিল। স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে এক মুহূর্ত্ত চুপ করে রইল মিনতি। ছ' বছরের শ্যামল ছুটে এসে ঘরে ঢুকল। বগল থেকে ইস্কুল ব্যাগটী তখনো সে খোলেনি। উত্তেজিত স্বরে শ্যামল বলতে লাগল; মা মা, রাস্তায় স্বদেশীদের পুলিশ মারছে।

কৃষ্ণকান্তি বারেক মিনতির দিকে তাকিয়ে, শ্যামলের দিকে ফিরে তাকাল। বললে; স্বদেশীদের কেন মারছে শ্যামল?

বন্দেমাতরম বলেছিল তাই। শ্যামল উত্তেজিত স্বরে বলতে লাগল: জান বাবা, আমার যদি একটা সত্যিকার বন্দুক থাকত, ওদের গুলি করে মারতাম।

মিনতি বললে, বলিস কি শ্যাম! লোকে যে তোকে খুনী বলবে! শ্যামল বললে; কেন মারবে ওরা আমাদের!

সেই কথাই ত ভাবছি। কৃষ্ণকান্তি কপটস্বরে বললে।

শ্যামল বললে, তুমি কিচ্ছু জাননা বাবা। স্বদেশীরা ইংরাজদের এদেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে চায়। কেন ওরা আমাদের দেশ অধিকার করে লুটেপুটে খাবে?

কৃষ্ণকান্তি বিস্মিতস্বরে বললে, এসব কথা কে তোকে বলেছে শ্যাম? কে আবার, চারুদা! শ্যামল বললে।

চারুবাবুর সঙ্গে কৃষ্ণকান্তির আলাপ ছিল। ইস্কুলের শিক্ষক চারুবাবু যে বিপ্লবীদলের লোক কৃষ্ণকান্তি ভাবতেও পারেনি। কৃষ্ণকান্তি আরো বিস্মিত হল, যখন শ্যামলের মুখে খবরটা শুনলে, ইস্কুলের ছেলেরা টিফিনের পয়সা জমিয়ে চারুদার সমিতির জন্য চাঁদা দেয়।

সেদিন অনেকরাতে আকাশে চাঁদ উঠেছিল। খোলা ছাদে মাদুরে বসে কৃষ্ণকান্তি। পাশেই শ্যামল ঘুমোচ্ছে। ঘরের কাজ সেরে মিনতি ছাদে উঠে এল। এক সময় আস্তে আস্তে বললে সে কৃষ্ণকান্তিকে; আমায় ক্ষমা কর। তখন তোমার কথায় আমার মন সায় দেয়নি। শ্যামলের ভবিষ্যতের কথাই আমি ভাবছিলাম; কিন্তু এখন মনে হচ্ছে আমার ভয় অমূলক। শ্যামলের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ করবে, তার পরিবেশ। যা তার হওয়া উচিত, শ্যামল তাই হয়ে উঠুক।

উত্তরে কৃষ্ণকান্তি মিনতির হাতে একটু চা প দিয়েছিল শুধু।

কৃষ্ণকান্তি ইংরাজের আইন-আদালত ছেড়ে স্বদেশীব্রত গ্রহণ করল। প্রতিবছরই কৃষ্ণকান্তি সোনাপুরে কুঞ্জবিহারীর বাড়ী বেড়াতে যেত। সেবার মিনতি ও শ্যামলকে নিয়ে কৃষ্ণকান্তি সোনাপুরে বেড়াতে এসেছে। গ্রামবাসীরা ত অবাক! স্বদেশী হুজুগে মেতে কৃষ্ণকান্তি মাসে হাজার টাকা আয়ের অমন প্র্যাকৃটিস ছেড়ে দিলে! অমন করে ছেলে ও বৌটাকে পথে বসাতে ওর একটুও বাধলো না! আর ওরাই বা কেমন! হাবভাব দেখে ত মনে হয় না কৃষ্ণকান্তির কাণ্ডকারখানায় তারা এতটুকু দুঃখিত। মিনতির কথা না হয় ছেড়ে দেওয়া গেল। কিন্তু ঐ যে এতটুকু ছেলে শ্যামল, ফড়ফড় করে ইংরাজের বিরুদ্ধে সেও কেমন বক্তৃতা দেয়! হাজার হোক ইংরেজ আমাদের রাজা। রাজার বিরুদ্ধে গেলেই শাস্তি পেতে হয়।

কুঞ্জ মাথা নেড়ে কৃষ্ণকান্তিকে বলেছিল; কাজটা কি ভাল হল?

—কোন কাজটা কাকা? কৃষ্ণকান্তি প্রশ্ন করেছিল, স্বদেশী করা না ওকালতি ছাড়া?

—ওকালতি করে কি দেশের কাজ করা যায় না কৃষ্ণ?

ছোট শ্যামল পাশে দাঁড়িয়েছিল। উত্তর দিলে সে-ই: না দা'দু, বাবা আর প্র্যাকটিস্ করবেন না।

কুঞ্জ অনেকক্ষণ ধরে মাথা নেড়ে অবশেষে বলেছিল, আমি তোমার কথাই ভাবছি শ্যাম।

কুঞ্জ দাদু আজ আর বেঁচে নেই। কিন্তু কে-ই বা বেঁচে আছে? শেফালি, উজ্জ্বলা, সুশীতল, রমেন, মাখন, বিনয় এরা সব ছিল শ্যামলের সহকর্ম্মী, একই ব্রতে ব্রতী। একই পথের পথিক। বিদেশী শাসকের হাত থেকে দেশকে স্বাধীন করবার ব্রতে ব্রতী, এরা সব নিজেদের বিশ্বাস অনুযায়ী হিংসা ও অহিংসার কর্ম্মপথ বেছে নিয়েছিল। আজ রাতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে কুঞ্জদাদুর সেদিনের ভবিষ্যতবাণীর কথা শ্যামলের মনে পড়ে। ছোট শ্যামলের ভবিষ্যত কুঞ্জদাদু জানতে পেরেছিল।

সেবার বরিশালে প্রাদেশিক সম্মেলনে পুলিশের আদেশ অমান্য করে বন্দেমা'তরম ধ্বনি করে, আরো অনেকের সাথে কৃষ্ণকান্তি গুরুতর আহত হয়ে হাঁসপাতালে গেল। কলকাতায় মিনতি তখন জ্বরে ধুকছে। সংবাদ পেয়ে বরিশালে যাবার জন্য সে ছটফট করতে লাগল। মিনতির অসুখ বেড়ে যায়। ছোট শ্যামল কি করবে ভেবে পায় না। এখানে মা, বরিশালে, হাঁসপাতালে বাবা শয্যাশায়ী। মাকে এ অবস্থায় ফেলে সে বরিশালে যেতে পারে না। অবশেষে মাথায় ব্যাণ্ডেজ নিয়ে কৃষ্ণকান্তি যখন ফিরে এলেন মিনতি তখন শেষ শয্যায়।

বিদেশে হাঁসপাতালে শয্যাশায়ী আহত স্বামীর জন্য ভেবে ভেবেই মিনতি

প্রাণ দিল। কৃষ্ণকান্তি আহত না হলে, কৃষ্ণকান্তি কাছে থাকলে হয়ত মিনতি মারা যেত না।

বাংলা দেশে তখন অগ্নি যুগ সুরু হয়েছে। বিদ্রোহী বীরবালক ক্ষুদিরাম ফাঁসী গাছে চড়ে সারা দেশে বিপ্লবের আগুন ছড়িয়ে দিয়ে গেছে। তরুণ ও যুব সমাজের ভেতর শ্বেতাঙ্গ বিদ্বেষের বীজ রোপিত হল। শ্যামল সেবারে ম্যাট্রিক দেবে। চারুদার ব্যায়াম-সমিতির একজন প্রধান পাণ্ডা সে। সেদিন পল্টু ও শ্যামল চারুদার সঙ্গে খিদিরিপুর ডকে বেড়াতে গেছল। চারুদা তাদের আমদানি রপ্তানি বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। এদেশ থেকে রাশি রাশি কাঁচামাল বিলাতে যায় আর সেই মালে তৈরী জিনিষই বিলাত থেকে ঘুরে আসে আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিসপত্ররূপে। ফিরবার পথে ট্রামে বসে এসব কথাই, বলছিল চারুদা। ইংরাজ শুধু শাসনই করে না, শোষণ ও করে। ইংরাজ শুধু হাতেই মারে না, ভাতে ও মারে।

পল্টু ঘুষি বাগিয়ে শ্যামলকে বললে, ইচ্ছা হয় কি জানিস? ব্যাটাদের ঘুষি মেরে এদেশ থেকে তাড়াই। শ্যামল বললে; কব্জিতে তোর এত জোর, দেখে ত মনে হয় না।

পল্টু বললে, দেখাব একদিন যদি সুযোগ পাই।

ষ্টপেজে ট্রাম থামতেই জনৈক ফিরিঙ্গি সিপাই গাড়ীতে উঠে শ্যামলদের পেছনের বেঞ্চে বসল। তার কোমরে রিভলভার ঝুলছিল। ঘৃণাভরা দৃষ্টিতে ট্রামের যাত্রীদের দেখে নিয়ে সে বুটযুক্ত একখানি পা পল্টুর পাশে রাখল। পল্টুর মুখ দিয়ে একটা শব্দও বার হয় না। শ্যামল বারেক পল্টুর দিকে তাকিয়ে উঠে দাঁড়াল। রাগে সে কাঁপছিল। বলে; ভদ্রলোকের মত পা নামিয়ে বস।

ফিরিঙ্গির লালমুখ ক্রোধে ও অপমানে আরো লাল হয়ে উঠল। বললে, হোয়াট? চারুদা ফিরে তাকাল। ফিরিঙ্গি তখনো পা নামায়নি। চারুদা

শান্তস্বরে বললে, তোমাকে পা নামাতে বলা হচ্ছে। ফিরিঙ্গি এবার একটা অকথ্য গালি পেড়ে বললে, নিগার। আর যায় কোথায়, বিরাশী সিক্কা ওজনের ঘুষির পর ঘুষি এসে পড়ল তার নাকে ও থুতনিতে। শ্যামের কব্জীতে যে এতজোর সে নিজেই জানত না। চারুদা তাকে থামাল। ট্রামে তখন রীতিমত হৈ চৈ পড়ে গেছে। গোরার সঙ্গে মারামারি এ দৃশ্য চোখে দেখার মত শক্তি ও অনেকের ছিল না সেদিন। ট্রাম থামিয়ে প্যাসেঞ্জারেরা পালাতে লাগল। তাদের সঙ্গে সঙ্গে পলটু ও পালাল। এদিকে ঘুষি খেয়ে ফিরিঙ্গি বিদ্যুৎবেগে কোমরের চামড়ার ব্যাগ থেকে রিভলবার বের করল। কিন্তু ছোরাখেলার প্যাঁচে অভ্যস্ত চারুদা চোখের পলকে তার হাতখানি এমন করে উর্দ্ধমুখী করে চেপে ধরলেন যে সে আর হাত নামাতে পারল না। পলকে শ্যামল তার হাত থেকে রিভলবার ছিনিয়ে নিয়ে দ্রুত ট্রাম থেকে নেমে পড়ে মাঠের মাঝখান দিয়ে দৌড়তে সুরু করল।

টোটাভরা রিভলবার! সর্ব্বনাশ। চারুদা প্রমাদ গণলেন। ফিরিঙ্গি তখন চেঁচাচ্ছে; পাকড়ো উসকো, পাকড়ো। হামারা গান লেকে চলা গিয়া। কিন্তু কে কাকে পাকড়ায়। চারুদা ও ফিরিঙ্গি বাদে ট্রামে আর তৃতীয় প্রাণী কেউ ছিল না। কন্ডাক্টর ও পালিয়েছে। সুযোগ বুঝে চারুদা ও একলাফে নীচে নেমে মাঠের দিকে ছুটতে লাগল। ফিরিঙ্গি কিন্তু ট্রাম থেকে নামতে সাহস করল না। যে কটা ঘুষি সে খেয়েছিল, এরপর মাঠে নেমে আর এদের খপ্পরে পড়ার সাহস তার নেই। তার উপর রিভলবারটা ও এখন ওদের হাতে!

মাঠের মাঝখানে এসে চারুদা শ্যামলকে ধরল। রাস্তা থেকে এ যায়গাটা দেখা যায় না। রিভলবারটা আমার কাছে থাক চারুদা! শ্যামল বললে; পাগল না ক্ষ্যাপা! রিভলবারটা কাছে রেখে শেষকালে খুন হবি নাকি! খুন করব শ্যামলদা। বলতে বলতে শ্যামলের চোখ দুটো জ্বলে উঠল: যারা আমাদের তিলে তিলে হত্যা করছে, সেই সব শোষণকারী বিদেশী দস্যুদের

খুন করব। অন্তত তাদের একজনকে ও যদি খুন করতে পারি জীবন ধন্য জ্ঞান করব।

পার্টি disciplineএর কথা ভুলে যেয়ো না শ্যামল। চারুদা গম্ভীর স্বরে বললে, সভ্যদের খেয়াল খুসী যা ইচ্ছা তা করা চলবে না একথা মনে রেখো। শ্যামলের হাত থেকে রিভলবারটা নিয়ে সন্তর্পণে চাদরের তলায় লুকিয়ে চারুদা বললে, যা এখন বাড়ী চলে যা। পিস্তলের কথা কাউকে বলিসনি যেন। শ্যামল তবুও দাড়িয়ে আছে দেখে বললে, আর এক মুহূর্ত্তও এখানে দাঁড়াসনি। এক্ষুণি পুলিশ আমাদের খুঁজতে আসবে।

চারুদা ও শ্যামল বিভিন্ন পথ ধরল।

সত্যি সত্যিই একটু পরে পুলিশভ্যান সশস্ত্র বন্দুকধারী একদল পুলিশ নিয়ে মাঠের মাঝখানে এসে থামল। সারা মাঠ চষে ও তারা একটা প্রাণী দেখতে পেল না। ঝোপ ঝাড়ের ভেতর পিস্তলটা কোথাও লুকানো থাকতে পারে ভেবে তারা অনেক খোজা খুজি করল। কিন্তু বৃথা। পুলিশভ্যান ফিরে গেল।

ব্যাপারটা কিন্তু সেখানেই শেষ হল না। হারানো পিস্তল ও প্রকৃত অপরাধীদের সন্ধান পাওয়ায় জন্য পুলিশ উঠে পড়ে লাগল। খবরের কাগজে পুরস্কার ঘোষণা করা হল।

শেষ পর্য্যন্ত পুলিশকে হয়ত চুপ করে থাকতে হত। কিন্তু পলটুই সব বেফাঁস করে দিল। ফিরিঙ্গির সঙ্গে মারামারির কথাটা চারুদার অনুরোধ সত্বেও সে কণ্ঠে চেপে রাখতে পারল না। ইস্কুলের সহকারী শিক্ষক রাজভক্ত রাজেনবাবুর নিকট ঘটনাটা একদিন সে ফলাও করে বললে। পাছে শ্যামল তার চেয়ে বেশী সাহসী একথা প্রমাণ হয়ে যায় তাই পলটু ইচ্ছে করেই শ্যামলের নামটা বললে না। চারুবাবুর উপর রাজেনবাবু নানা কারণে অপ্রসন্ন ছিল। শুধু পুরস্কার ও সরকারী খেতাব লাভই নয়, সঙ্গে সঙ্গে

চারু বাবুকেও ইস্কুল থেকে তাড়ানো—একঢিলে দুই পাখী মারবার এ সুযোগ কি সহজে ছাড়া যায় ?

পরদিন চারুবাবুর এ্যারেষ্ট হওয়ার খবর ইস্কুলে ছাত্র মহলে চাঞ্চল্য ও উত্তেজনার সৃষ্টি করল। চারুবাবু ছাত্রদের খুব প্রিয় ছিল। সব চেয়ে বেশী উত্তেজিত হল শ্যামল। কারণ সেই ত ফিরিঙ্গিকে ঘুষি মেরেছিল। রিভলবারটা শ্যামলই ফিরিঙ্গির হাত থেকে কেড়ে নিয়ে যায়। সেদিন ইস্কুল থেকে বাড়ী ফিরে এসে শ্যামল পুলিশ কমিশনারকে চিঠি লিখতে বসল। চিঠিতে সেদিনকার ঘটনা বর্ণনা করে ফিরিঙ্গির অশিষ্ট আচরণের কথা উল্লেখ করলে শ্যামল। রিভলবার যে কেড়ে নিয়েছে শাস্তি তাকে না দিয়ে ফিরিঙ্গিকেই দেওয়া উচিত; কেন না পিস্তল কেড়ে না নিলে ফিরিঙ্গি কাউকে হত্যা করত নিশ্চয়। শ্যামল লিখলে রিভলবার চারুদা কেড়ে নেননি। বস্তুত রিভলবারের কথা চারুদা কিছুই জানেন না। এ চিঠির লেখকই রিভলবারটি কেড়ে নিয়েছিল। পুলিশ কমিশনার দয়া করে তাকে এ্যারেষ্ট করবেন কি ? চিঠি পেয়ে পুলিশ যে তাকে এ্যারেষ্ট করবে, শ্যামলের কোন সন্দেহ ছিল না। চৌদ্দ বছরের শ্যামলের বীরত্বের কথা ইস্কুলের ছেলেদের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়বে। গর্ব্বে ভরে উঠে তার বুক। চিঠিখানি হাতে করে সে সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত নামছে। এক্ষুণি এটা ডাকবাক্সে ফেলে দেওয়া চাই। কৃষ্ণকান্তি সিড়ি দিয়ে উপরে উঠছিল। শ্যামলকে দেখে থমকে দাঁড়াল। বললে, কোথায় যাচ্ছিস ?

শ্যামল চিঠিখানি প্যাণ্টের পকেটে লুকাতে যাচ্ছিল, কৃষ্ণকান্তির দৃষ্টি এড়াল না। কাকে চিঠি লিখছিস ? কৃষ্ণকান্তি প্রশ্ন করল; কুঞ্জ দাদুকে বুঝি ? শ্যামল উত্তর দিল না। কৃষ্ণকান্তি একটু বিরক্তির স্বরে বললে; কথা বলছিস না যে ? শ্যামল এবার উত্তর দিলে; না, কুঞ্জ দাদুকে লিখিনি। কোনবন্ধুকে বুঝি ? কৃষ্ণকান্তি আবার প্রশ্ন করল। খুব গোপনীয় পত্র ? এমন কি শিরোনামাটাও আমাকে দেখানো চলে না ? শ্যামল বিব্রত হল।

পিতার সঙ্গে তার সম্বন্ধ বন্ধুত্বের। কৃষ্ণকান্তি বিশ্বাস করে, ষোলবছর থেকে নয়, পাঁচ বছর বয়স থেকেই ছেলের সঙ্গে বন্ধুর মত আচরণ করা উচিত। তাই, এমন কোন বিষয় নেই, যা নিয়ে কৃষ্ণকান্তির সঙ্গে আলোচনা করতে শ্যামল দ্বিধাবোধ করে। কৃষ্ণকান্তিকে কখনো সে কিছু লুকায়নি। আজ এই প্রথম চিঠিখানি লুকোবার চেষ্টা করে পিতার কাছে ধরা পড়ে সে বিব্রত হল। অথচ এ-চিঠির কথা কৃষ্ণকান্তিকে সে বলেই বা কেমন করে?

এদিকে কৃষ্ণকান্তিও কম আশ্চর্য হয়নি। শ্যামল ত কখনও এমনটা করেনি। শ্যামলের, বন্ধু-বান্ধবের নাম ত তার অজানা নয়। এমন কে থাকতে পারে, যার কথা পিতাকে বলতে সে লজ্জায় লাল হয়ে উঠছে! নতুন কোন বান্ধবী? কৃষ্ণকান্তি মনে মনে হাসল। এ-বয়সে ছেলেরা মেয়েদের কথায় অনাবশ্যক লজ্জা পায়, একথা তার অজানা নয়। কিন্তু শ্যামলের ত সে শিক্ষা নয়।

শ্যামল মাথা নীচু করে উপরের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে। নীচের সিড়িতে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কৃষ্ণকান্তি। কি একটা কথা বলে সে উপরে উঠতে যাচ্ছিল, এমনি সময় চিঠিখানি শ্যামলের হাত থেকে নীচের সিড়িতে কৃষ্ণকান্তির পায়ের উপর এসে পড়ল। চিঠিখানির শিরোনামা দেখে চমকে উঠল কৃষ্ণকান্তি। কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে কৃষ্ণকান্তি চিঠিখানি কুড়িয়ে নিল। টু দি কমিশনার অব পুলিশ। কৃষ্ণকান্তি জোরে জোরে পড়ল। তারপর শ্যামলের দিকে তাকিয়ে বললে; মানে? পুলিশ কমিশনারের সাথে তোর কি দরকার শ্যামল?

শ্যামল এবার মাথা তুললে। সে ত অন্যায় কিছু করেনি। কেন সে ভয় পাবে, কেন সে লজ্জা পাবে? বললে, দরকার আছে বাবা।

কৃষ্ণকান্তি অভিমান ভরে চিঠিখানি শ্যামলের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগল। শ্যামল এক মুহূর্ত কি ভেবে চিঠিখানি নিয়ে বাবার ঘরে ছুটে এল। এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাবার সঙ্গে

আলোচনা না করে চিঠি লিখে, শ্যামল অন্যায় করেছে। বাবার কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত তার।

কৃষ্ণকান্তি চারুবাবুর মুখে সেদিনের ঘটনার কথা সবই শুনেছিলেন, সব শুনে তিনি খুসীই হয়েছিলেন। শ্যামলের কাজে তার মত পিতার পক্ষে খুসী হওয়াটাই ত স্বাভাবিক। কৃষ্ণকান্তি আশা করেছিল, এ নিয়ে শ্যামলই তার সঙ্গে প্রথমে কথা কইবে। কিন্তু শ্যামল নিজে থেকে এ প্রসঙ্গ যখন তুললে না, কৃষ্ণকান্তি ও চুপ করে রইল। এখন পুলিশ কমিশনারের নামে চিঠি দেখে, ব্যাপারটা আঁচ করে নিতে তার কষ্ট হল না। এ নিশ্চয়ই স্বীকারোক্তি, চারুবাবুর সঙ্গে শ্যামল ও জেলে যেতে চায়।

কৃষ্ণকান্তি জানত চিঠিখানি দেখাতে শ্যামল তার কাছে ফিরে আসবেই। তবু ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বারেক সে দেখে নিল।

বাবা! ঘরে ঢুকে শ্যামল অবরুদ্ধ স্বরে বলতে লাগল, বাবা আমি— বসো শ্যামল। কৃষ্ণকান্তি বললে। শ্যামল একখানি চেয়ারে জড়সড় হয়ে বসল। কৃষ্ণকান্তি আস্তে আস্তে বলতে লাগল; আচ্ছা শ্যামল সত্যি করে বলত, কোনটা তুমি চাও,—লোকের বাহবা কুড়ানো, না লোক চক্ষুর অন্তরালে থেকে সত্যিকারের দেশের কাজ করা?

আমি···আমি কাজ করতে চাই বাবা। শ্যামল বললে। তবে এ চিঠি লিখেছ কেন? কৃষ্ণকান্তি প্রশ্ন করলে।

শ্যামল বিস্মিত হল। বাবা চিঠির কথা জানলেন কেমন করে? হ্যাঁ, আমি সবই জানি। কৃষ্ণকান্তি বলতে লাগল, আর এ-ও জানি যে এ-চিঠি পুলিশের হাতে পড়লে তোমার ত জেল হবেই, চারুবাবুও মুক্তি পাবেন না। তা না হলে চারুবাবুর বিরুদ্ধে ওদের কোন প্রমাণ ছিল না।

শ্যামল চুপ করে রইল। কৃষ্ণকান্তি বলতে লাগল; ক্লাশের ছেলেদের বাহবা কুড়াবার জন্য নিজেকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিয়ে তুমি চারুদার সর্ব্বনাশ করতে বসেছ শ্যামল।

শ্যামল দুহাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগল। তার হাত থেকে চিঠিখানি মেঝেয় পড়ে গেল। কৃষ্ণকান্তি তার মাথায় হাত রেখে বলতে লাগল, হুজুগ নয় শ্যাম, চাই কাজ, সত্যিকারের কাজ। দেশকে জাগাতে হবে।

……আজ প্রায়ান্ধকার ঘরে দড়ির খাটিয়ায় শুয়ে বাবার কথা মনে পড়ে শ্যামলের। বাবার উপদেশ সে অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে। সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থেকেও কখনো সে নেতাগিরির জন্য আত্মপ্রচারের চেষ্টা করেনি। আজ এই ভেবে শ্যামল একটা পরম স্বস্তিবোধ করছে, যে, শত শত অজ্ঞাত অখ্যাত স্বাধীনতার সৈনিকেরই একজন সে।

চিঠিখানি কুড়িয়ে শ্যামল নিজের হাতে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে জানলা দিয়ে ফেলে দিল। কৃষ্ণকান্তি দেখতে পেয়ে বললে, উঁহু, এমন করে ফেলতে নেই। পুলিশকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য যখনই কোন দলিল নষ্ট করবার আবশ্যক হবে, দেশলাই জ্বালিয়ে তা পুড়িয়ে দেওয়াই best, কথাটা মনে রেখ। ভবিষ্যতে কাজে লাগবে।

চারুদা মুক্তি পেল। একটা মিথ্যে মোকদ্দমা চারুদার বিরুদ্ধে সাজাবার চেষ্টা করেছিল পুলিশ, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তা টিঁকল না।

অদ্ভুত লোক ছিল চারুদা। নিজের বলতে তার কিছুই ছিল না। খাওয়া-দাওয়ার কোন ঠিক-ঠিকানা ছিল না তার। কোনদিন হোটেলে, কোনদিন বা বন্ধু-বান্ধব কারো বাড়ীতে খেয়ে দিন কাটাত চারুদা। ব্যায়াম-সমিতির অফিস ঘরেই সে ঘুমোতো। ইস্কুলে শিক্ষকতা করে যা মাইনে পেত, তার সবটাই সমিতির জন্য ব্যয় করত। তার নিজের কোন অভাববোধ ছিল না। অথচ দিনরাত কি খাটুনিটাই না খাটত সে! আর চারুদার মুখে হাসি লেগেই থাকত।

শ্যামল তখন কলেজে পড়ে। সেদিন রাত্রে চারুদা তাকে ডেকে পাঠাল। চুপি চুপি বললে, শ্যামল বিপ্লবের কাজে আমি আত্মগোপন করছি। কিছুদিন

পর ভারতের বাইরে চলে যাব। সেখান থেকে পার্টির জন্য অস্ত্রশস্ত্র আমদানী করবার চেষ্টা করব।

চারুদা একটু থেমে বলতে লাগল, তোমার উপর আমার অনেক আশা শ্যামল। ইস্কুল কলেজের ছেলেদের যত বেশী দলে টানতে পার, ততই ভাল। তাদের বুকে পরাধীনতায় আগুন জ্বালানো, এ হবে তোমার কাজ। কিন্তু সাবধান,— ভুলে যেয়ো না, পণ্টুর মত ছেলেও এদেশে আছে।

শ্যামল চারুদার পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে বললে, আপনার কথা মনে থাকবে চারুদা। চারুদা বলতে লাগল, কিন্তু যে কারণে তোমায় ডেকেছি তা এখনো বলা হয়নি। কতগুলো বই ও চিঠিপত্র আমি তোমার কাছে রেখে যেতে চাই শ্যামল। এগুলো খুব সাবধানে রাখবে, কারণ এ যদি পুলিশের হাতে পড়ে পার্টির সমূহ ক্ষতি হয়ে যাবে!

হ্যাঁ, শ্যামল মাথা নাড়ল। এগুলো খুব সাবধানেই সে রাখবে।

চারুদার অন্তর্ধানের পর থেকে শ্যামল দ্বিগুণ উৎসাহে রিক্রুটিং সুরু করল। ছাত্র ও যুবকদের শাসকের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রচার করা ছিল সমিতির একটা প্রধান কাজ। বই পড়িয়ে, স্বদেশী বিষয় আলোচনা করে তাদের স্বদেশপ্রেম জাগিয়ে তোলা হত। তখন তারা নিজেরাই সমিতিতে এসে দাঁড়াত।

…কলেজ সোস্যালে এসরাজ বাজিয়ে সুশীতল নাম করেছে। ছাত্র ছাত্রীরা সবাই তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কদিন ধরে শ্যামল সুশীতলকে একা পাওয়ায় সুযোগ খুঁজছিল। সেদিন সিঁড়ির নীচে সহসা দেখা হয়ে গেল। ভাগ্যক্রমে ভক্তরা তখন সুশীতলের সঙ্গে ছিল না।

এই যে আপনাকেই খুঁজছিলাম। শ্যামল স্মিত হেসে বললে।

আমাকে? সুশী থমকে দাড়াল। বললে, কেন বলুন ত? কোথাও সঙ্গৎ করতে হবে নাকি? তা যদি হয়, আগেই বলে দিচ্ছি মোটেই আমার সময় নেই:

খুব পড়াশোনা করছেন বুঝি আজকাল? শ্যামল প্রশ্ন করল।

হ্যাঁ, সুশী বললে; বাধ্য হয়েই পড়তে হয়। প্রাইবেট টিউশন করি কিনা।

চার চারটে টিউশন করি। দুটো গানের আর দুটো ম্যাট্রিক ক্লাশের ছেলের, একটু থেমে বললে।

অনেক টাকা রোজগার করছেন তা'লে। শ্যামল বললে।

মাফ করবেন স্যার, সুশী বললে, চাঁদা দিতে পারব না। চাঁদার জন্য অনুরোধ করে লজ্জা দেবেন না।

কথা বলতে বলতে তারা এগোচ্ছিল। মোড়ে এসে শ্যামল পেছনে পড়তেই সুশী ফিরে তাকাল। বললে, কিন্তু আমাকে কেন খুঁজছিলেন বললেন না ত? শ্যামল হেসে বললে, কিন্তু বলার সুযোগ আর দিলেন কোথায়? সুশী বললে, সুযোগ কি কেউ কাউকে দেয় নাকি? সুযোগ করে নিতে হয়। যাকগে, যা বলবার এবার চটপট বলে ফেলুন ত। শুনে আমার প্রাণ জুড়াক।

শ্যামল কি ভেবে বললে; আমি যে-কথা আপনাকে বলতে চাই, রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে সেকথা বলা চলে না, সুশীবাবু। আজ ত আপনি ব্যস্ত। কলেজ ছুটীর পর কাল ময়দানের দিকে বেড়াতে আসুন না।

একদল ছেলে সরগোল করতে করতে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। তাদের থেকে কে একজন চেঁচিয়ে উঠল; স্পাই!

চমকে উঠে শ্যামল ফিরে তাকাল। ভীড়ের ভেতর শ্যামল পণ্টুকে দেখতে পেল। কথাটা সুশীও শুনেছিল। বললে সে, কাকে mean করল, আপনি না আমি?

—কিম্বা সে তার নিজের কথা বলে আমাদের সাবধান করে দিয়ে গেল, ঠিক বুঝতে পারছি নে। শ্যামল বললে।

তাও ত বটে। সুশী হেসে বললে। শ্যামল সে হাসিতে যোগ দিল।

…সেদিন সেই যে বন্ধুত্বের সূত্রপাত হয়, এ বন্ধুত্ব তাদের ভেতর চিরকাল অটুট ছিল। সুশী সমিতিতে যোগ দিয়েছে শুনে দু' একজন হিতৈষী বন্ধু তাকে বাধা দিল। গান গাওয়া, এসরাজ বাজানোই যার কাজ, বিপ্লবের রক্তাক্ত পথে কি তাকে মানায়?

কিন্তু সুশী কাণ দেবার ছেলে নয়। দুদিনেই সে সমিতির একজন বিশিষ্ট কর্ম্মী হয়ে উঠল।

বিছানায় পাশ ফেরে শ্যামল। সেসব দিনের কথা আজ মনে পড়ে। দুই বন্ধুতে মিলে কত সায়াহ্ন গোধুলি দেশের নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে কাটিয়ে দিয়েছে। চোখে ছিল তাদের স্বপ্ন। এ স্বপ্ন নিজেদের ঘিরে নয়, এ স্বপ্ন দেশকে ঘিরে। একদিন এ-দেশ বিদেশী শাসকের হাত থেকে মুক্ত হয়ে আবার পূর্ব্বগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হবে, এই ছিল বিপ্লবীদের স্বপ্ন।

কংগ্রেস সংগঠনের কাজে কৃষ্ণকান্তি দূর গ্রামদেশে ঘুরে বেড়াত। শ্যামল এখন বড় হয়েছে, কলকাতার বাড়ীতে একা থাকতে তার অসুবিধে নেই। তা ছাড়া বৈকুণ্ঠ চাকরটার উপর নির্ভর করা যায়।

শ্যামলদের বসবার ঘর তরুণ বিপ্লবীদের আড্ডা হয়ে উঠল। সুশীতল মেস ছেড়ে শ্যামলের বাড়ী এসে আস্তানা নিল। শ্যামল অবশ্য সব কথাই চিঠিতে বাবাকে লিখত। কৃষ্ণকান্তির উত্তর আসত, তুমি যা ভাল বোঝ তাই কর। এদিকে কৃষ্ণকান্তি অনেকদিন ধরেই হৃদরোগে ভুগছিল। দিন তার ফুরিয়ে আসছে, সে জানত! কিন্তু শ্যামলকে এসব কথা কখনো লিখত না সে। অবশেষে যা ঘটবার তাই ঘটল। সেই যে অসুস্থ শরীর নিয়ে কৃষ্ণকান্তি কলকাতায় ফিরে এসে শয্যা নিলে, আর সে উঠল না।

কৃষ্ণকান্তির মৃত্যুতে শ্যামল সত্যিই বড় আঘাত পেল। বাবা যে তার কতখানি ছিলেন, একথা শুধু শ্যামলই জানত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা শ্যামল পশ্চিম দিকের বারান্দায় চুপ করে বসে থাকত। স্নান নেই, খাওয়া নেই,

শোওয়া নেই। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, শ্যামল বসে আছে ত আছেই। সুশী শঙ্কিত হয়ে উঠল।

....অনেক রাত। আকাশে চাঁদ হেলে পড়ছে। সুশীর ঘুম ভেঙ্গে গেল। শ্যামল তাকে দুহাত দিয়ে ঠেলছে। বিছানায় উঠে বসল সুশী। শ্যামল বললে, সুশী আমার কলমটা খুঁজে পাচ্ছিনে।

কলম? সুশী বললে: কলমে কি হবে?

হ্যাঁ কলম। শ্যামল বলতে লাগল; আমি লিখব সুশী। কলমটা খুঁজে দাও।

লিখবে? সুশী বিমূঢ় স্বরে বললে।

শ্যামল সারারাত বসে কবিতা লিখলে। পরদিন সকালবেলা সুশী সে কবিতা পড়ে মুগ্ধ হল। গভীর দুঃখের মাঝখানে বেদনার ফুল ফুটেছে। কৃষ্ণকান্তিকে হারিয়ে শ্যামল কবি হয়ে উঠল।

ছোট মেয়ে শেফালির সঙ্গে সেবারই তার প্রথম দেখা হয়।

তিন

গরমের ছুটীতে কুঞ্জদাদুর বাড়ীতে বেড়াতে এসেছে শ্যামল। পুকুরঘাটে দাঁড়িয়ে ছ' সাত বছরের ফুটফুটে মেয়ে শেফালি বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকে দেখছিল। সুটকেশ হাতে শ্যামল তার সামনে থমকে দাঁড়াল। বললে, তুমি কাদের মেয়ে গো? শেফালি বললে, বলব কেন? ঘাটে বসে নন্দা বাসন মাজছিল। বললে, কে রে শেফালি? পরক্ষণে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াতেই সে শ্যামলকে দেখতে পেল। শ্যামল! নন্দা খুসীর স্বরে বললে:

পিসিমা! বলতে বলতে শ্যামল ঘাটের দিকে এগিয়ে গেল। ততক্ষণে নন্দা হাত ধুয়ে উপরে উঠে এসেছে। নন্দা কুঞ্জদাদুর মেয়ে। শেফালি তার একমাত্র সন্তান। বিধবা হয়ে নন্দা সম্প্রতি বাপের বাড়ীতে এসেছে।

শ্যামল স্যুটকেশটি মাটিতে রেখে নীচু হয়ে নন্দার পায়ের ধুলো মাথায় নিল। নন্দা আশীর্ব্বাদ করে বললে, শরীর ভাল ত?

শেফালি চোখ বড় বড় করে শ্যামলকে দেখছিল। নন্দা বললে, তোর শ্যামলদা। পায়ের ধুলো নে।

শেফালি ঠোঁট উল্টিয়ে বললে, বয়ে গেছে আমার পায়ের ধুলো নিতে!

শুনে শ্যামল একটু হাসল, বললে, তোমার মেয়ে পিসিমা? দ্যাখো, আমি চিনতেই পারিনি। সেবার যখন ওকে দেখি, কথা বলতেই শেখেনি।

নন্দা স্মিতমুখে বললে, পাঁচ বছর পর তোর সঙ্গে দেখা হল।

হ্যাঁ পাচ বছর। শ্যামল মনে মনে হিসাব করে বললে; দেখতে দেখতে বছরগুলো যে কেমন করে কেটে যায় বুঝতে পারিনে। কি নাম বললে ওর?

শেফালি, নন্দা বললে। শ্যামল বললে, শেফালি। চমৎকার নাম ত। নিজের নামের প্রশংসা শুনে কোন মেয়ে না খুসী হয়? শেফালি বারেক ইতস্তত করে ছুটে এসে শ্যামলের পায়ের ধুলো মাথায় নিলে। শ্যামল তাকে দুহাতে শূন্যে মাথার উপর তুলে ধরল বারেক। বললে, আবার প্রণাম করা হচ্ছে, দস্যি মেয়ে। শেফালি অভিমান করে বললে, আমি বুঝি দস্যি? শ্যামল তাকে আদর করে বললে, দস্যি হওয়া ত খুব ভাল।

নন্দা হেসে বললে, যেদিন তোমার চিঠি এল, সেই থেকে রোজই এক প্রশ্ন—দাদা কবে আসবে, মা। শেফালির দিকে তাকিয়ে শ্যামল বললে, সত্যি নাকি শেফালি? শেফালি লজ্জিত হল। নন্দা বললে, ঐ দ্যাখো তোমাকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রেখে গল্প স্থরু করেছি। শেফালি, দাদাকে বাড়ী নিয়ে যা' ত। বাসন ক'খানি নিয়ে আমি এক্ষুণি আসছি।

শেফালি রাস্তা থেকে স্যুটকেশটা তুলে এগোতে চেষ্টা করল কিন্তু পারল না। শ্যামল তার হাত থেকে স্যুটকেশটা নিয়ে বললে, এস বাড়ী যাই।

কুঞ্জদাদু কোদাল দিয়ে উঠানের ঘাস কাটছিল। বেহায়া ঐ ঘাসগুলো

দুদিনেই গজিয়ে উঠে আবার। উঠানটা দাওয়ার মত ঝকঝকে পরিষ্কার না থাকলে রাত্তিরে কুঞ্জদাদুর ঘুমই হয় না। বাইরে শ্যামলের গলা শুনে কোদাল ফেলে দিয়ে কুঞ্জদাদু ছুটে এল। শ্যামলকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললে, শ্যাম! তার কণ্ঠ অশ্রুতে রুদ্ধ হয়ে এল। কৃষ্ণকান্তিকে হারানোর ব্যথা কুঞ্জদাদু তখনো ভুলেনি। কুঞ্জদাদু বলতে লাগল, তোর জন্য কতদিন পথ চেয়ে বসে আছি। দাদুকে কি এমন করে ভুলে থাকতে হয়, শ্যাম?

শ্যামল স্মিতমুখে বললে, দাদুকে কি কখনো ভোলা যায়?

কুঞ্জদাদু মাথা নেড়ে বললে; কৃষ্ণ আমার কতখানি ছিল তুই ত জানিস। কিন্তু তুই যেন আমাকে পর করে দিস নে।

শ্যামল কুঞ্জদাদুর হাতে একটু চাপ দিয়ে বললে, কিছুদিন পরিপূর্ণ বিশ্রাম নিয়ে শরীরটাকে ভাল করে তোলবার জন্য এবার এলাম দাদু। আবার যখনই বিশ্রাম নেওয়ার দরকার হবে তোমার কাছে ছুটে আসব।

তা ত আসবিই। কুঞ্জদাদু বললে, তুই আসবি বলে আমি যে পথ চেয়ে থাকি।

শ্যামল জানে, কুঞ্জদাদুর অভিযোগের সঙ্গত কারণ রয়েছে। কিন্তু এই ছুটির সময়টাতে সমিতির কাজ এত বেড়ে যায় যে, নিয়মিত খাওয়া শোওয়ারও সময় করে উঠতে পারে না শ্যামল। তাই এ ক বছর শ্যামল সোনাপুরে আসতে পারেনি।

আয়, সরে আয়, কুঞ্জদাদু বললে। শেফালি আর একবার সুটকেশ ধরে টানাটানি করছিল। শ্যামল হেসে বললে, বড় হও আগে। তখন দাদার সুটকেশ বইবে। কুঞ্জদাদু হেসে বললে, কি গো শেফালি, দাদার সঙ্গে এরি ভেতর জমিয়ে নিয়েছ দেখছি।

শেফালি কুঞ্জদাদুকে জিভ দেখিয়ে ভেংচি কাটে।

হুঁ, আবার জিভ দেখানো হচ্ছে, কুঞ্জদাদু হেসে বললে। জানিস

শ্যাম, এ মেয়েটা সারাদিন টো টো করে ঘুরে বেড়ায়। কারো কথা শোনে না।

শেফালি শ্যামের মুখের দিকে তাকাল। শ্যামলও কি কুঞ্জদাদুর কথায় সায় দেবে? শ্যামল বললে, ও, তাই নাকি? সারাদিন টো টো করে ঘুরে বেড়ানো ত খুব ভাল।

কুঞ্জদাদু কপট ক্রোধে বললে, বটে? এমন দাদা না হলে কি আর শেফালি দিদি আমার দুমিনিটেই ন্যাওটা হয়ে উঠে! তোদের স্বদেশী দলে ওকে ভর্ত্তি করে দে'না, শ্যাম।

শ্যামল হাসতে লাগল। নন্দা থালা বাসন নিয়ে ঘাট থেকে ফিরে এল। বললে, এখনো উঠানে দাঁড়িয়ে গল্প হচ্ছে? বারান্দায় উঠে বস না শ্যাম। বসব'খন পিসিমা। শ্যামল বললে।

রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে নন্দা বঁটি দিয়ে আম কাটতে লাগল। এখন আমের সময়। বাড়ীতে কেউ এলে, গ্রাম দেশে প্রথমেই তাকে আম খেতে দেওয়া হয়। শ্যামল পাশে দাঁড়িয়েছিল। বললে, চা করছ ত পিসিমা?

নন্দা হেসে বললে, হ্যাঁ।

শেফালি এক মুহূর্ত্ত কি ভেবে নিজের সঞ্চিত ভাণ্ডার থেকে গোটা দুই টুকটুকে পাকা আম নিয়ে এল। বললে, এ দুটো দাদাকে কেটে দাও মা। নন্দা বললে, দিচ্ছি গো দিচ্ছি।

...সেদিনের সেই ছোট মেয়ে শেফালি, শ্যামলের চোখের উপর আজো ভেসে উঠছে। বেণী দুলিয়ে যখন সে চলত, কী সুন্দরই না দেখাতো তাকে! সেবারে শ্যামল যে ক'দিন সোনাপুরে ছিল, শেফালি ছায়ার মত সব সময় তার সঙ্গে থাকত। আর শেফালিকে ছাড়া শ্যামলের এক মুহূর্ত্ত চলত না। আম বাগানে আম পাড়তে শেফালিকে সঙ্গে নিয়ে যেত শ্যামল। গাছে চড়ে শ্যামল দুহাত দিয়ে ডালে ঝাকুনি দিত। পাকা আমে গাছের তলাটা

ভর্ত্তি হয়ে যেত। নীচে দাঁড়িয়ে শেফালি। দেরী সইত না তার। গাছের ডাল থেকে শ্যামল চেঁচাত, সরে দাঁড়া, মাথায় লাগবে যে। কোঁচড় ভর্ত্তি করে নিয়ে শেফালি ও শ্যামল বাড়ী ফিরত। হ্যাঁ, ছোট বন্ধুটী শ্যামলের দিনগুলো মধুর করে তুলেছিল।

রোজ বিকাল বেলা গাঁয়ের ছেলেদের লাঠি ও ছোরা খেলা শেখাত শ্যামল। গ্রামের মেয়েরা কেউ আসত না, শেফালিরও ছোরাখেলা শেখা চাই। দশটা গ্রাম ঘুরে, বাড়ী বাড়ী বই ভিক্ষে করে ;—ও কলকাতা থেকে কিছু বই আনিয়ে শ্যামল সোনাপুরে একটা লাইব্রেরী করেছিল। শেফালি তখন অবশ্য প্রথমভাগ পড়ত। কিন্তু শ্যামলদার সঙ্গে লাইব্রেরীতে যাবার উৎসাহ তার কম ছিল না কিছু। আর শ্যামলেরও যেন কি হয়েছে। শেফালিকে সঙ্গে না নিয়ে গেলে তার কোন কাজেই মন বসত না।

সেদিন শেফালির একটুখানি সর্দ্দিজ্বর হয়েছে। নন্দা রেগে বলেছে, উঠানে নামলে চেলাকাঠ দিয়ে পা দুখানা ভেঙ্গে দেবে। শেফালি শ্যামলের সঙ্গে বেরোবার বন্দোবস্ত করছিল। মার রণচণ্ডী মূর্ত্তি দেখে একটু দমে গেল। শ্যামল ইসারায় কি একটা বলে বেরিয়ে গেল। পরক্ষণেই কোঁচড় ভর্ত্তি আম নিয়ে ফিরে এল। শেফালির প্রিয় সিঁদুরেপোড়া গাছের আম। কিন্তু শেফালি কিছুতেই সে আম স্পর্শ করবে না। বিছানায় আমগুলো রেখে শ্যামল বললে ; এত রাগ! শেফালি বললে, কে তোমায় আম আনতে বলেছে। শ্যামল কপট অভিমান করে বললে ; পিসিমা তোমায় আটকে রাখলে আর দোষটা হল আমার? শেফালি উত্তর দিল না।

কি ভেবে শ্যামল বললে ; গান শুনবে?

শেফালি শ্যামলের দিকে তাকিয়ে সম্মতি সূচক মাথা নাড়লে।

শ্যামল বললে, গাইতে পারি যদি তুমি আমার সঙ্গে গাও।

বারে! শেফালি বললে, আমি বুঝি গাইতে জানি? শ্যামল গাইতে সুরু করল।

ধনধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা
তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা
ও যে স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।
এমন দেশটী কোথাও খুঁজে পাবে নাক তুমি
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।

একবার, দুবার, তিনবার দেখিয়ে দিতেই শেফালি গাইতে সুরু করল। শেফালির গান শুনে কুঞ্জদাদু ও নন্দা ত আশ্চর্য্য। তারা দরজায় এসে দাঁড়াল। শ্যামল বললে, শেফালির 'মেমারি' খুব 'সার্প', দাদু। কুঞ্জদাদু ইংরেজী জানে না। কথাটা ঠিক বুঝতে না পেরে বললে, কি, কি বললে শ্যাম? শ্যামল বললে, ওর স্মৃতিশক্তি খুব তীক্ষ্ন। হুঁ, কুঞ্জদাদু বললে, গানের পদ গুলো ঠিক ঠিক মনে রাখতে পেরেছে বলে বলছিস? তা, অমন গান আমাদেরই মুখস্থ হয়ে যায়। ধন-ধান্যে পুষ্পে ভরা, আহা হা।

শেফালি বললে, গাও ত দেখি তুমি দাদু?

কুঞ্জদাদু আমতা আমতা করে বললে, তা তা ই'চ্ছে করলে গাইতে পারি বই কি। শেফালি বললে, ছাই পার। আচ্ছা বল ত, স্বাধীনতা মানে কি?

স্বাধীনতা? কুঞ্জদাদু কেশে গলা সাফ করে বললে, স্বাধীনতা মানে াধীনতা। শেফালি বললে, তুমি কিছু জান না দাদু। স্বাধীনতার মানে আমাদের জন্মগত অধিকার।

নন্দা এতক্ষণ চুপ করে শুনছিল। শেফালির কথা বুঝতে না পেরে বললে, জন্মগত কি? তোমাদের কথাবার্ত্তার এক বর্ণও আমার মাথায় ঢুকছে না।

শ্যামল হেসে বললে, নাই বা মাথায় ঢুকল, পিসিমা। তার চেয়ে তুমি গান শোন। এস শেফালি, গানটা আবার গাই।....

সোনাপুরে গরমের ছুটী কাটিয়ে শ্যামল নবীন উদ্দীপনা নিয়ে কলকাতায় ফিরে এল। সুশী হেসে বললে, কুঞ্জদাদুর বাড়ীতে একমাস থেকে, দেখছি মুটিয়ে গেছিস।

শ্যামল বললে, তাজা শাকসব্জী, তাজা মাছ, ঘরের ঘি দুধ, আর মাঠের খোলা হাওয়া, এ খেলে শরীর কার না সারে বল্‌?

বিকাল বেলা বসবার ঘরে বসে গল্প হচ্ছিল। শ্যামল বলতে লাগল, তোকে কত করে বললাম, কিন্তু তুই ত আমার সঙ্গে এলি না।

সুশী বললে, আমার 'টুর প্রগ্রাম' কিন্তু শেষ হয়ে উঠেনি, ভাই। ভাবছি আসছে হপ্তায় রওয়ানা হব।

শ্যামল বললে, যেতে পার কিন্তু বাইরে গিয়ে বসে থাকলে ত চলবে না। বিনয়, গোরা ও সাধন এল। রীতিমত আড্ডা জমে উঠল। সুশী বৈকুণ্ঠকে ডেকে বললে, পাঁচ কাপ চা নিয়ে এস বাবা বৈকুণ্ঠ!

সাধন বললে, কাগজে তোমার লেখাটা নিয়ে রীতিমত সাড়া পড়ে গেছে। তুমি যে এত ভাল লিখতে পার, বিনয় বললে, কই এতকাল ত আমরা ঘুণাক্ষরেও জানতাম না। সুশী ফোঁড়ন দিলে; ও নিজেই জানত না। গোরা বললে, মানুষ নিজের সম্বন্ধেই বা কতটুকু জানে! কিন্তু তুমি যাই বল সুশী, ভেতরে আগুন না থাকলে কলম দিয়ে কি কখনো ও জিনিস বেরোয়?

বিনয় বললে, সুরেশদা তোমার লেখার প্রশংসা করছিলেন, শ্যামল। পার্টির leaflet গুলো এবার থেকে তোমাকেই লিখতে দেওয়া হবে।

শ্যামল অবিশ্বাসের স্বরে বললে, leaflet! সুরেশদা আমাকে leaflet লেখার চান্স্‌ দেবেন?...

উৎসাহ পেয়ে শ্যামলের লেখার ঝোঁক বেড়ে গেল। কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ; প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ সে লিখে চলল! । 'ওঠ জাগো দাসত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কর, পরাধীনতার শৃঙ্খল দাও ভেঙ্গে।'

"পাগলামো তুই আয় রে দুয়ার ভেদি।
শিকলদেবীর এই যে পূজাবেদী চিরকাল কি রইবে খাড়া ?"

'বিচিত্রবীর্য্য' নামে শ্যামল কাগজে লিখত। কিন্তু শ্যামলই যে বিচিত্রবীর্য্য, তার উৎসাহী পাঠকবর্গের অনেকেই কথাটা জানত। অনেক সময় ক্লাশে বসে শ্যামল লিখত।

সমিতির কাজে সুশী মফস্বল গেছে। শ্যামল বাড়ীতে একা। সেদিন সন্ধ্যাবেলা বসবার ঘরে নিজের যায়গায় বসে শ্যামল লিখছিল। সিঁড়িতে হাই হিল জুতোর শব্দ শুনে শ্যামল মুখ তুলে দরজায় তাকাল। সে একটু বিস্মিতই হল। এখানে তার কাছে ত কোন মহিলার আসার কথা নয়! দরজায় একখানি ছেঁড়া পর্দ্দা ঝুলছিল, হাইহিল, দরজার সামনে থমকে দাঁড়াল।

ভেতরে আসুন, শ্যামল নিজের যায়গা থেকে বললে। পরক্ষণেই জনৈক তরুণী পর্দ্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকল। দীপ্ত উজ্জ্বল মেয়েটীর মুখশ্রীর দিকে তাকিয়ে এক মুহুর্ত্ত শ্যামল চুপ করে রইল। ঘরের এককোণে বসেছিল বলে, মেয়েটী প্রথমে তাকে দেখতে পায়নি। সে যখন এপাশ ওপাশ তাকিয়ে তাকে খুঁজছে, শ্যামল চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। বললে, সুশীতলকে চান ত ?

মেয়েটী বললে, হ্যাঁ। আমার নাম উজ্জ্বলা।

ও, হ্যাঁ হ্যাঁ, শ্যামল বললে; আপনার কথা আমি সুশীর মুখে শুনেছি। সুশী আপনাকে এসরাজ শেখায়, বসুন।

উজ্জ্বলা একখানি চেয়ারে বসে বললে, এ সপ্তায় সুশীবাবু একদিন ও আমাকে এসরাজ শেখাতে যাননি, তাই খবর নিতে এলাম।

শ্যামল বললে, সুশী কলকাতায় নেই। দিন কয়েক বাদে ফিরবে। ফিরে এলেই আপনার কথা বলব।

বলবেন দয়া করে, উজ্জ্বলা বললে। কিছু মনে করবেন না, আপনার নাম শ্যামলবাবু, না? শ্যামল মাথা নাড়লে, হ্যাঁ। উজ্জ্বলা বললে, বিচিত্র-বীর্য্য নামে আপনিই ত কাগজে লিখেন?

কই না ত! শ্যামল বললে; আমার নাম শ্যামল।

উজ্জ্বলা বললে, সে জানি। কিন্তু আপনি নিজের নাম দিয়ে কাগজে লিখেন না কেন? পাছে পুলিশ ধরে নিয়ে যায়, তার জন্যে বুঝি ছদ্মনামে লিখেন? উজ্জ্বলা কথাটা এমন সহজ করে বললে, যেন শ্যামলের সঙ্গে ওর অনেক দিনের পরিচয়। সে যে লেখক নয়, এবার আর শ্যামল অস্বীকার করতে পারে না। বললে, পুলিশের হাতে ধরা দেওয়াটা কি খুব বীরত্বের কাজ? তা কে বলছে! উজ্জ্বলা উত্তর দিল। তারপর সামনের টীপয় থেকে একখানি বই তুলে দেখতে লাগল। বললে, 'বিপ্লবের পথে ভারত'। এ বইখানি কতদিন ধরে আমি খুঁজছি। এটা পড়তে দেবেন আমাকে? কালই ফিরিয়ে দোব খন।

শ্যামল বললে, অত মোটা বই একদিনেই পড়া হয়ে যাবে?

রাত জেগে শেষ করব'খন, উজ্জ্বলা বললে। তারপর বইখানি কোলের উপর রেখে বললে, শ্যামলবাবু, আমাকে অপনাদের দলে নেবেন? উজ্জ্বলার স্বরে আন্তরিকতা ছিল। সে বলতে লাগল, সুশীবাবুর মুখে আপনাদের কথা যেদিন শুনেছি, সেদিন থেকেই পার্টিতে ভর্ত্তি হওয়ার কথা ভাবছি। কিন্তু সুশীবাবু হেসেই উড়িয়ে দেন। কেন, আপনাদের সঙ্গে কি মেয়েদের কাজ করার অধিকার নেই?

সত্যি বলতে কি, সে যুগে মেয়েদের সামাজিক অধিকার না থাকায় বিপ্লবীরা তাদের দলে টানবার চেষ্টা ও করে নি। শ্যামল বললে, অধিকার নিশ্চয় আছে। কিন্তু বিপ্লবীদের পথ কাঁটায় ভর্ত্তি। ও পথে দুঃখকষ্টের শেষ নেই। অত কষ্ট সহ্য করবার মত মেরুদণ্ড সব মেয়ের নেই। তা ছাড়া,—

তা ছাড়া কি ? উজ্জ্বলা প্রশ্ন করল, তার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে। সে অনেক কথা, এখন থাক। শ্যামল আস্তে বললে।

উজ্জ্বলা বিদ্রূপের স্বরে বললে, দুঃখকষ্ট সইবার ক্ষমতা সব মেয়ের নাই জানি, কিন্তু সব ছেলেরই কি তা আছে ?

উজ্জ্বলার কথা শুনে শ্যামল মনে মনে তার বুদ্ধির তারিফ না করে পারল না। কিন্তু বাইরে বললে ; তা ত নেইই।

উজ্জ্বলা বললে, আমি দেখাতে চাই, মেয়েরাও ছেলেদের মত স্বাধীনতার যুদ্ধের শহীদ হতে পারে।

শ্যামল এক মুহূর্ত্ত উজ্জ্বলার দিকে তাকিয়ে রইল। কে এই মেয়েটি, এ প্রেরণা কোথা থেকেই বা পেল সে ! বাইরে মোটরের হর্ণ বেজে উঠতেই উজ্জ্বলা বললে, আর বসব না। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললে, বইটা তাহলে নিয়ে যাচ্ছি। কালই ফিরিয়ে দোব।

একটু ভেবে শ্যামল বললে, কাল আপনি আসবেন না। কাল বিকেলে আমি বেরিয়ে যাব। উজ্জ্বলা বললে, তাহলে পশু আসব।

বৈকুণ্ঠ বাজার নিয়ে ফিরছিল। উজ্জ্বলাকে দেখে থমকে দাঁড়াল। বললে চা দোব দাদাবাবু ? উত্তর দিল উজ্জ্বলাই। বললে, না। আমি আর বসব না। বৈকুণ্ঠ ভেতরে চলে গেলে উজ্জ্বলা বললে, দেখুন, আপনার চেয়ে আপনার চাকরের ভদ্রতাজ্ঞান বেশী। শ্যামল হেসে উত্তর দিল, সে কথা ঠিক। সামাজিকতার ভার ওর উপরই। তা ছাড়া তখন ইচ্ছে করলেও আমি আপনাকে চা খাওয়াতে পারতুম না। কারণ বৈকুণ্ঠই আমার সবে ধন নীলমণি।

মোটরের হর্ণ আবার বেজে উঠল। উজ্জ্বলা বললে, আপনি লিখছিলেন, আমি না এলে লেখাটা নিশ্চয়ই অনেক দূর এগোত। আমি এসে আপনাকে বিরক্ত করলাম। শ্যামল বললে, কিচ্ছু না। বরং মাঝে মাঝে এসে এমন ধারা বিরক্ত করলে আমি খুসী হ'ব।

উজ্জ্বলা তার দীপ্ত চোখ দুটো এক মুহূর্ত শ্যামলের চোখে রাখল। তারপর দ্রুত বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

শ্যামল কিছুক্ষণ লেখায় মন দিতে পারল না। এক অদ্ভুত অনুভূতি, কিছু বা আনন্দের, কিছু বা বেদনার এক অনুভূতি তার সারা মন আচ্ছন্ন করে দিল। শ্যামল বারেক জানালায় এসে দাঁড়ল। প্রথম বসন্তের এক ঝলক উচ্ছল হাওয়ার মত উজ্জ্বলা এসে শ্যামলের জগতে ক্ষণিকের চাঞ্চল্য জাগিয়ে গেছে। নিথর জলে হাওয়া কাঁপুনি জাগাল, উঠল ঢেউ। বসন্তের দুরন্ত বাতাস।

আশ্চর্য্য! একি ভাবছে শ্যামল! বিপ্লবীর জীবনে মন দেওয়া-নেওয়া ভালবাসাবাসির স্থান নেই। ভাল করেই শ্যামল একথা জানে। দেশই তার প্রিয়া, দেশই তার মা, তার ধ্যান, ধারণা, ধর্ম্মকর্ম্ম, সব। দেশের জন্য তার জীবন উৎসর্গীকৃত। দেশকে স্বাধীনতার পথে এগিয়ে দেবার জন্য, প্রদীপের সলতের মত তিলে তিলে সে নিজেকে পোড়াবে। হ্যাঁ, এই ত বিপ্লবীর জীবন।

কিন্তু বই ধার নেবার জন্য উজ্জ্বলা প্রায়ই শ্যামলের কাছে আসতে লাগল। এসব বই অবশ্য বাইরে পাওয়ায় কোন উপায় ছিল না। বই সাক্ষী রেখে দুটী তরুণ হৃদয় পরস্পরের প্রতি কখন আকৃষ্ট হল, তারা নিজেরাই জানল না।

টাকা টাকা টাকা। অর্থাভাবে সমিতির কাজকর্ম্ম বন্ধ হতে চলেছে। কর্ম্মীরা অনাহারে দিন কাটাক তাতে কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু কাজ ত বন্ধ করা চলে না। সেদিন রাতে সুরেশদা শ্যামলকে ডেকে পাঠাল। সাধন, গোরা ও বিনয় আগেই এসেছিল। সুরেশদা বললে, এ সপ্তায় যেমন করে হোক কিছু টাকা যোগাড় করতে হবে আমাদের। শ্যামল জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সুরেশদার দিকে তাকাল। সুরেশদা বললে, তোমার বন্ধু উজ্জ্বলার বাড়ীতে

ডাকাতি করা ছাড়া টাকা যোগাড়ের আর কোন পথ নেই। তাই কাজের ভারটা তোমাকেই আমি দিতে চাই।

শ্যামল উজ্জ্বলার বাড়ীতে একাধিক বার গেছে। উজ্জ্বলারা বড়লোক। বাড়ীতে বাতের রোগী মা ছাড়া উজ্জ্বলার আর কেউ ছিল না। অবশ্য চাকর বাকর ছাড়া।

উজ্জ্বলার বাড়ীতে সে ডাকাতি করবে?

কিন্তু লজ্জা, সঙ্কোচ. ভয়, বিপ্লবীদের এ তিন থাকতে নেই। শ্যামল আস্তে আস্তে বললে, আপনার আদেশ আমি মাথা পেতে নিলাম, সুরেশদা। প্ল্যান ঠিক হল। শনিবার সন্ধ্যাবেলা শ্যামল উজ্জ্বলাকে নিজের বাড়ীতে ডেকে পাঠাবে। ছলে বলে কৌশলে শ্যামল তাকে ঘণ্টা খানেক সময় আটকে রাখবে। এই অবসরে সাধন, গোরা ও বিনয় উজ্জ্বলার মাকে রিভলবার দেখিয়ে টাকাকড়ি গয়না পত্র ইত্যাদি নিয়ে পালাবে।

উজ্জ্বলার এক দূর সম্পর্কের মামা পুলিশে চাকরী করে। শ্যামলের সঙ্গে উজ্জ্বলার মেলা মেশাটা সে ভাল চোখে দেখত না। এ ব্যাপারে সে তাকে সাবধান করবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু উজ্জ্বলা তাকে হেসেই উড়িয়ে দিয়েছে। শ্যামলকে সে ভাল করে জানে, বিপ্লবীদলের সঙ্গে শ্যামলের বিশেষ কোন সম্বন্ধ নেই। উজ্জ্বলার বাড়ীতে ডাকাতি হতে পারে এ রকম একটা গুজব গুপ্তচর মহল থেকে পুলিশ-মামার কাণে এসেছিল। কিন্তু যে হেতু তারিখটা সাধন, গোরা, বিনয় ও শ্যামল ছাড়া পার্টির লোকেরা ও জানত না, তাই পুলিশ-মামা তারিখের কথা কিছুই শোনে নি।

সেদিন বিকাল বেলা মামা উজ্জ্বলাকে কথাটা বলতেই, অভ্যাস মত সে হেসে উড়িয়ে দিল। বললে, মামার যেমন কল্পনা? কিন্তু উজ্জ্বলার মা বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে এমন চেঁচামেচি সুরু করলেন, যে বাড়ীতে যেন ডাকাত পড়েই গেছে। শীগগিরই বাড়ী পাহারা দেবার জন্য ও জন কয়েক

বন্দুকধারী সিপাইর বন্দোবস্ত করা হবে, উজ্জ্বলার মাকে ভরসা দিয়ে মামা বিদায় নিলে সেদিন।

পরদিন সন্ধ্যাবেলা শ্যামল উজ্জ্বলাকে ডেকে পাঠাল। উজ্জ্বলা যদিও শ্যামলের বাড়ীতে একাধিক বার যাওয়া আসা করেছে, এই প্রথম শ্যামল তাকে ডেকে পাঠল। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে উজ্জ্বলার বুক দুরু দুরু কাঁপছিল।

বসবার ঘরে শ্যামল অধৈর্য্য হয়ে অপেক্ষা করছে। উজ্জ্বলা পর্দ্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকল। শ্যামল তাকে অভ্যর্থনা করে বললে, বস উজ্জ্বলা।

উজ্জ্বলা খানিকটা তফাতে একখানি চেয়ারে বসল। বললে কেন আমায় ডেকেছ? প্ল্যান ছিল, শ্যামল উজ্জ্বলাকে বলবে বিপ্লবীদের নিয়ে সে একখানি উপন্যাস লিখছে। মতামতের জন্য, মোটামুট গল্পের কাঠামোটা সে আগেই উজ্জ্বলাকে শুনাতে চায়। এর পর শ্যামল এমন এক রসালো গল্প ফেঁদে বসবে এক ঘণ্টা সময় কোন দিক দিয়ে কেটে যাব উজ্জ্বলা জানতেই পারবে না। কেন ডেকেছ? উজ্জ্বলা আবার প্রশ্ন করল।

শ্যামল কেশে বলতে লাগল, উজ্জ্বলা আমি—আমি একখানি উপন্যাস লিখব এবার। উজ্জ্বলা বললে; তা আমাকে কি করতে হবে?

গল্পটা নিয়ে তোমার সঙ্গে, শ্যামল ইতস্তত করে বললে, মানে ইয়ে আলোচনা করব, উজ্জ্বলা। উজ্জ্বলা উঠে দাঁড়াল। সাহিত্য ও শিল্পকলায় তার অজ্ঞতা পর্ব্বত প্রমাণ, এই সেদিন ও শ্যামল তাকে ঠাট্টা করে বলেছিল। বললে, তামাসা করছ?

তামাসা কেন করব? শ্যামল বললে।

বল তোমার গল্প। উজ্জ্বলা নিজের চেয়ারে বসে বললে।

শ্যামল বলতে লাগল, এক ছিল ইয়ে, বিপ্লবী। তার ছিল ইয়ে,—শ্যামল কাশতে লাগল। সত্যি বলতে কি শ্যামল মনে মনে কোন গল্পই তৈরী করেনি। তার ধারণা ছিল গল্প যখন সে বলবে মনে মনে তখনি তা তৈরীও হয়ে যাবে।

উজ্জ্বলা বললে, সত্যি করে বলত, আমায় কেন ডেকেছ?

শ্যামল বললে, বলব যদি তুমি লক্ষীমেয়ের মত ঘণ্টাখানেক সময় এখানে বস।

আর যদি না বসি? উজ্জ্বলা প্রশ্ন করল।

এর ভেতর যদি বলে কিছু নেই, বললে শ্যামল, একঘণ্টার জন্য তুমি আমার বন্দী। উজ্জ্বলা বারেক শ্যামলের দিকে তাকিয়ে অবিশ্বাসের দৃষ্টি হেনে বললে, তুমি আমায় আটকে রাখবে? জোর করে?

হ্যাঁ। শ্যামল দরজা আগলে দাঁড়িয়ে বললে।

চোখের পলকে কি হয়ে গেল, বিশ্বসংসার উজ্জ্বলার চোখের সামনে ঘুরতে লাগল। একি করলে উজ্জ্বলা। শ্যমলকে আঘাত করতে সেত কখনো চায়নি। তাকে আটকে রাখার পেছনে শ্যমলেব যে উদ্দেশ্যই থাকুক না কেন, কোন দুরভিসন্ধি ছিল না, একথা উজ্জ্বলার চেয়ে বেশী দুনিয়ায় আর কেউ জানে না। শ্যামল দরজায় দাঁড়িয়ে হাসছে।

উজ্জ্বলা চেয়ারে ফিরে এসে দুহাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগল।

শ্যামল স্মিতমুখে বললে, বুঝতেই পাচ্ছ, তোমাকে এখানে ডেকে আনাব পেছনে একটা ষড়যন্ত্র রয়েছে। আমায় ক্ষমা কর উজ্জ্বলা, আরো কিছুক্ষণ তোমায় এখানে বসতে হবে।

মামার কথাট উজ্জ্বলার মনে পড়ল। মামা তাকে ডেকে সাবধান করেছিল! তবে কি এখনই এরা তাদের বাড়ীতে ডাকাতি করতে গেছে? অশ্রুসিক্ত মুখখানি তুলে উজ্জ্বলা শ্যামলের দিকে তাকাল।

শ্যামল বললে, হ্যাঁ, যা ভাবছ তাই। কিন্তু ভয় পাবার কিছু নেই, উজ্জ্বলা। বাধা না পেলে, ওরা কারো ক্ষতি করবে না। আর তোমার মা বাধা দেবেন না, এত তুমি জানই।

উজ্জ্বলা অশ্রুরুদ্ধ স্বরে বললে; কিন্তু কেন—কেন আমাকে তুমি সব কথা বলনি। শ্যামল বললে, বলবার হুকুম ছিল না।

ও, উজ্জ্বলা বললে। শ্যামল বলতে লাগল। ডাকাতির সময় সামনে থাকলে পাছে তুমি বাধা দাও, সেজন্যই তোমাকে ডেকে এনেছি। কিন্তু উজ্জ্বলা, তোমাকে আর আটকে রাখব না। শুধু আমার একটী অনুরোধ, আরো মিনিট কুড়ি বাদে তুমি বাড়ী যেয়ো।

উজ্জ্বলা বললে, থানা থেকে পুলিশ নিয়ে বাড়ী পৌছুতে দশমিনিট ও লাগবে না, মনে আছে আশা করি।

শ্যামল হাসতে লাগল। বললে, আমি জানি তুমি তা পারবে না।

সহসা উজ্জ্বলা গলার হার ও হাতের চুড়ি ক'গাছি খুলে শ্যামলের সামনে একখানি কাউচে ছুঁড়ে মারল। কপট ক্রোধে বললে, সোনাদানা, গয়নাগাটী সবই ত ডাকাতি করে নিলে, তবে আর এই কগাছি রেখে কি হবে। চতুর মেয়ে উজ্জ্বলা। হার ও চুড়ি শ্যামল হয়ত নিতে চইবে না, তাই এই ভাণ। কিন্তু শ্যামলের কাছে সে ধবা পড়ে যায়।

শ্যামল বললে, এগুলো নিয়ে যাও উজ্জ্বলা।

উজ্জ্বলা দরজা থেকে বললে, আমাকে যে এতক্ষণ আটকে রেখেছিলে তার শাস্তি। সুরেশদাকে বল, পার্টির জন্য এগুলো দিয়েছি।

উজ্জ্বলা তখন যদি জানত, তারই দেওয়া হার ও চুড়ি শ্যামলকে এমন ভাবে ফাঁসাবে।....

ডাকাতিটা অবশ্য নির্ব্বিঘ্নেই সমাধা হয়েছিল। উজ্জ্বলার মা ও বাড়ীর চাকরেরা এত ভয় পেয়েছিল যে, সাধনেরা কোন বাধাই পায়নি। তারা সরে পড়ার ঘণ্টা খানেক পরে থানায় খবর পৌছিল। পুলিশ ছুটে এল। উজ্জ্বলা একটি কথাও বললে না, গুম হয়ে বসে রইল সে।

পুলিশ-মামার সজাগ দৃষ্টি বরাবরই শ্যামলের উপর ছিল। সেদিন রাতেই শ্যামলের বাড়ী খানাতল্লাস করা হল। উজ্জ্বলার গয়না তখনো কাউচের উপর পড়ে। শ্যামল ধরা পড়ল। উজ্জ্বলা আদালতে

সাক্ষী দিতে চেয়েছিল, এ গহনা সে নিজে শ্যামলকে দিয়েছে। কিন্তু সুরেশদা অনেক বুঝিয়ে তাকে নিরস্ত করল।

ডাকাতির অভিযোগে সাতবছরের জেল হল শ্যামলের। এই প্রথম জেলে যাওয়া।

…শ্যামল নিশ্বাস মোচন করল। পাশের বাড়ীর ছাদে প্যারাস্যুট শিল্কের নিশান হাওয়ায় উড়ছে। পর্দায় প্রতিফলিত ছায়াছবির মত সারি সারি মুখমণ্ডল শ্যামলের মনের চোখে ভেসে উঠে। এরা সব সহধর্ম্মী, সহকর্ম্মী, একই পথের পথিক। আপন ভোলা, সর্ব্বহারা এইসব বন্ধুদের কথা ভেবে আজো তার চোখে জল আসে। বুকটা শূন্য মনে হয়।

এরা তার আত্মীয় ছিল না, কিন্তু আত্মীয়েরও বেশী ছিল। বিপ্লবীদের পরস্পরের ভেতর একটা প্রাণের টান ছিল। এরা পরস্পরকে গভীর ভালবাসত। এমন কি বাপ-মা ভাইবোনদের ভালবাসার সঙ্গেও এই নিঃস্বার্থ প্রেমের তুলনা হয় না।

চার

শ্যামল যখন জেল থেকে বেরিয়ে এল, অসহযোগ আন্দোলন অনেককাল বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু আন্দোলনকারীদের উপর ইংরাজ সরকারের অত্যাচার জনসাধারণের ভেতর যে বিক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল, সেই বিক্ষোভতরঙ্গ তখনো থামেনি। ফুলের মালা হাতে করে একদল ছেলে জেল-ফটকের সামনে দাঁড়িয়েছিল। জয়ধ্বনি করে তারা শ্যামলের গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দিতে চাইলে। শ্যামল প্রতিবাদ করে বললে, ফুলের মালা গ্রহণ করবার মত কোন যোগ্যতাই আমার নেই, ভাই। আমায় ক্ষমা কর।

যে ছেলেটী মালা হাতে সামনে দাঁড়িয়েছিল, সে একটু নিরাশ হল। বললে, এযে জয়মাল্য, শ্যামলদা। কংস কারাগার থেকে বেরিয়ে আসার দিন, এ মালা সবাইকেই পরতে হয়।

শ্যামল থমকে দাঁড়াল। কংস কারাগার! হ্যাঁ, কংস কারাগারই বটে। ছেলেরা শ্যামলের গলায় মালা পরিয়ে দিয়ে আর একবার জয়ধ্বনি করল। পেছনে উজ্জ্বলা দাঁড়িয়েছিল। এগিয়ে এসে শ্যামল তার সামনে দাঁড়াল। এক মুহূর্ত্ত পরস্পব পবস্পরের দিকে গভীর সমবেদনার দৃষ্টিতে তাকায়। খানিকটা তফাতে উজ্জ্বলার মোটর দাঁড়িয়েছিল। নীরবে দুজনে গাড়ীতে উঠে বসল।

মোটরে উজ্জ্বলাই প্রথম কথা কইলে। বললে, তোমাকে আবার দেখতে পাব এক মুহূর্ত্ত আগেও যেন ভরসা পাচ্ছিলাম না।

জেলে বিপ্লবীদের উপর যে অকথ্য অত্যাচার হয়, তারই ইঙ্গিত করে শ্যামল বললে, আমাকে আমি আবার জেলের বাইরে দেখতে পাব, তাই কি ভরসা ছিল? কিন্তু, অভিজ্ঞতা থেকে জানলাম উজ্জ্বলা, মানুষের সহ্য শক্তির সীমা নেই। শুধু দুঃখ, নৈরাশ্য নয়,—অসহ্য শারীরিক যন্ত্রণা সহ্য করেও মানুষ মরে না।

উজ্জ্বলা সহানুভূতিভরা দৃষ্টিতে শ্যামলের দিকে তাকাল।

শ্যামল বললে, আমার কথা ত গেল, এবার তোমার সব কথা বল।

উজ্জ্বলা হেসে বললে, সাত বছরের কথা কি একদিনে বলা যায়?

শ্যামল সহসা নৈর্ব্যক্তিক হয়ে উঠল। উজ্জ্বলার কথার উত্তর না দিয়ে বললে, তারপর পার্টির খবর কি?

কোন্ পার্টির কথা বলছ? উজ্জ্বলা শুধাল।

শ্যামল বললে, পার্টি—আমাদের পার্টি।

উজ্জ্বলা বললে, বহুকাল তার কোন অস্তিত্ব নেই। বিনয় ও গোরা এখনো আন্দামানে। শঙ্করদার ফাঁসি হয়েছে।

সাধন ও সুধা এই ক'মাস হল জেল থেকে বেরিয়ে এসেছে। স্বাস্থ্যহীন, উদ্যমহীন। আরো অনেকেই জেল থেকে বেরিয়ে এসেছে। কেউ কেউ জীবিকার জন্য দোকানপাঠ খুলেছে। বেণুদা মানিকতলায় পাঁঠার দোকান

করেছেন। দোকানের সামনে বড় করে সাইনবোর্ড লাগিয়েছেন, "রাজবন্দীর পাঁঠার দোকান।" শ্যামল হেসে বললে, বল কি? তারপর এক মুহূর্ত্ত কি ভেবে বললে, তা'লে কি বিপ্লব-আন্দোলনের সমাধি হয়ে গেছে, উজ্জ্বলা? উজ্জ্বলা বললে, তা কি কখনো হয়? স্বাধীনতার আগুন অনির্ব্বাণ। পুরাণো পার্টি ভেঙ্গেছে, তার জায়গায় অনেক নতুন পার্টি গজিয়েছে, এসেছে নব নব প্রাণবন্যা।

শ্যামল বললে, ওদের অত্যাচার যত বাড়বে, দেশের পক্ষে ততই মঙ্গল কিন্তু সাত বছর তোমার কেমন করে কাটল বলনি ত উজ্জ্বলা?

উজ্জ্বলা স্মিতমুখে বললে, তুমি ত শুনতে চাওনি।

শ্যামল হেসে বললে, বিপ্লবীদলের মেয়েরাও সেন্টিমেন্টল হয়, তা ত জানতাম না। বিয়ে করনি কেন?

কেন যে করিনি, উজ্জ্বলা উত্তর দিলে, আমি নিজেই ঠিক জানিনে। মা অবশ্য বিয়ের জন্য খুব জেদাজেদি করতেন। জুটিয়েও ছিলেন, বিলাত ফেরত আই. সি. এস। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনে আমার ছমাস জেল হয়ে যাওয়ায়, শেষপর্য্যন্ত বিয়েটা ভেঙ্গে গেল। জেল থেকে বেরিয়ে আসার কিছুদিন পর মা মারা গেলেন। চিঠিতে সে কথা ত তোমাকে লিখেছিলাম।

হ্যাঁ, শ্যামল বললে, সে কথা তুমি লিখেছিলে। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনে জেলে যাওয়ার কথা লেখনি। তারপর?

উজ্জ্বলা বললে, তারপর ক বছর আর কিছু কাজ না পেয়ে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পর পর দুটো পরীক্ষা পাশ করে ফেললাম।

তা'হলে তুমি এখন গ্রাজুয়েট, তাই বল। শ্যামল খুসীর স্বরে বললে। উজ্জ্বলা স্মিতমুখে সম্মতি সূচক মাথা নাড়লে। শ্যামল বললে, কিন্তু উজ্জ্বলা পার্টির জন্য এত খেটেও, পরীক্ষা পাশ করবার সময় তুমি কোথায় পেলে বল ত?

পার্টি? উজ্জ্বলা বিস্মিত হওয়ায় ভান করল।

শ্যামল বললে, জেলে তরুণ সমিতির রাধিকাবাবুর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। রাধিকাবাবু তোমার নাম করছিলেন, কিন্তু।

উজ্জ্বলা উদাস স্বরে বললে, হ্যাঁ, রাধিকাবাবুর দলের সাথে আমার যোগাযোগ ছিল অবশ্য। কিন্তু শ্যামল, একটু ভেবে সে বলতে লাগল, এখন তুমি বেরিয়ে এসেছ, সুশী, রমেন ও সাধন বাইরে আছে; আমাদের কর্ম্মসূচী আমরাই স্থির করব। শ্যামল উত্তর কোন দিল না।

কলেজ ষ্ট্রিট ও হারিসন রোডের মোড়ে এসে মোটর থামল। ট্রাফিকের ভীড়ে রাস্তাটা বন্ধ হয়ে গেছল। শ্যামল বললে, আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি উজ্জ্বলা?

আপাতত আমার বাড়ীতে। উজ্জ্বলা বললে, সেখান থেকে তোমার বাড়ীতে যাবে। অবশ্য তোমার যদি আপত্তি না থাকে।

আপত্তি? শ্যামল বললে, তুমি বল কি উজ্জ্বলা! সাতবছরের সঞ্চিত অবসাদে আমার হাত পা অবশ হয়ে আসছে। তোমার ওখানে একটু বিশ্রাম করতে পাব, তার চেয়ে আশার কথা, এই মুহূর্ত্তে আমার আর কিছু মনে পড়ছে না।

শ্যামলের মুখের দিকে তাকিয়ে এক মুহূর্ত্ত উজ্জ্বলা কথা খুঁজে পায় না। সাত বছরের একটানা কারাজীবনের ক্লান্তি সে যেন শ্যামলের চোখে মুখে দেখতে পায়।

নিজের বাড়ীর কথা শ্যামলের মনে পড়ল। কৃষ্ণকান্তি কলকাতায় বাড়ী করেছিলেন। সম্পত্তি বলতে ঐ বাড়ীখানিই ছিল।

শ্যামল বললে, আমাদের বাড়ীটা কি তালাবন্ধ, উজ্জ্বলা? বৈকুণ্ঠ নিশ্চয় অনেকদিন চলে গেছে?

উজ্জ্বলা হেসে বললে, না, বৈকুণ্ঠ যায় নি।

শ্যামল বিস্মিত স্বরে বললে, তাহ'লে এখনো সে বাড়ী পাহারা দিচ্ছে? কিন্তু আমি ত ওকে টাকা পয়সা কিছুই দিয়ে যেতে পারিনি। ওর চলছে কেমন করে? তা ছাড়া বাড়ীটার Maintenance খরচও ত আছে। উজ্জ্বলা উদাস স্বরে বললে, কাল বাড়ী গেলেই সব জানতে পাবে। শ্যামল বললে, সুশী এখন কোথায়, উজ্জ্বলা?

তোমার বাড়ীতেই ত উঠেছে, উজ্জ্বলা বললে, শুধু সুশীই না, দলের কর্ম্মী মফঃস্বল থেকে যারা দুচার দিনের জন্য কলকাতায় আসে তারাও ওখানে থাকে।

শ্যামলের বুঝতে বাকী রইল না, উজ্জ্বলাই এসব খরচ যোগাচ্ছে। কিন্তু সে চুপ করেই রইল। কথাটা তার মনে পড়ল, সুশী যদি কলকাতায় থাকে, উজ্জ্বলার ওখানে না গিয়ে, বাড়ী যাওয়াই ত ভাল! বললে, সুশী কি এখন কলকাতায় নেই, উজ্জ্বলা?

উজ্জ্বলা বললে, আমার ওখানে না গিয়ে সোজা বাড়ী যাওয়ার কথা ভাবছ ত? সুশী বাইরে গেছে, কাল আসবে। আর সুশী থাকলেও, আজকের দিনটা, আমি তোমাকে কিছুতেই ছাড়তাম না, এ ঠিক জেনো।

উত্তরে শ্যামল নিঃশ্বাস ছাড়ল। আরামের কি উদ্বেগের ঠিক বোঝা গেল না।

উজ্জ্বলার সংসারে ঝি চাকরের অভাব নেই। কিন্তু উজ্জ্বলা আজ শ্যামলের জন্য নিজের হাতে রান্না করলে। খাওয়া দাওয়ার পর শ্যামল ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম যখন ভাঙল, অনেকক্ষণ সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে। দীর্ঘ দিনের অভ্যাস অনুযায়ী, শ্যামলের মনে হয়, নির্জ্জন কারাকক্ষে সে শুয়ে আছে। কিন্তু পরক্ষণেই সব কথা মনে পড়ে তার। সে এখন উজ্জ্বলার বাড়ীতে। উজ্জ্বলার কথা মনে পড়তেই সহসা মার মুখখানি মনের চোখে ভেসে উঠল। একটা অজ্ঞাত ব্যথায় বুকের ভেতরটা টনটন করে উঠে।

আজ যদি মা বেঁচে থাকতেন, তিনিও উজ্জ্বলার মত ব্যস্ত সমস্ত হয়ে উঠতেন।

আলো জেলে উঠতেই শ্যামল বিছানায় উঠে বসল।. উজ্জ্বলা বললে, বিকাল বেলা এসে দেখলাম তুমি ঘুমোচ্ছ। তাই আর জাগালাম না। চা আনব?

উজ্জ্বলা, শ্যামল বললে, আমি বাড়ী যাচ্ছি।

এখনই? উজ্জ্বলা বললে।

হ্যাঁ, এখনি। শ্যামল আলনা থেকে পাঞ্জাবীটা গায়ে চড়িয়ে দিলে। খেয়ে যাবে না? উজ্জ্বলা প্রশ্ন করল।

না উজ্জ্বলা, শ্যামল বললে, আমি এখুনি যাব।

উজ্জ্বলার মুখের ভাব শক্ত হল। সে আর কিছু বললে না।

বাস্‌স্টপটা ঠিক সামনেই। শ্যামল রাস্তা থেকে নিজের বাড়ীখানির দিকে বারেক তাকাল। একমাত্র দোতালার বসবার ঘরে আলো জ্বলছে। বাদ বাকী আর সব ঘরই বন্ধ। দুপাশের আলোকোজ্জ্বল বাড়ী গুলোর মাঝখানে, বাড়ীখানিকে কেমন নিঝুম মনে হয়।

দরজা খোলাই ছিল। শ্যামল সিঁড়ি বেয়ে সোজা উপরে উঠে এল। ভেজানো দরজায় হাত দিতেই খুলে গেল। ঘরের ভেতর প্রবেশ করে শ্যামল এক মুমূর্ত্ত থমকে দাঁড়াল। তার দৃষ্টি ঘরের চারপাশে ঘুরে বেড়াতে লাগল। গোটা চারেক দড়ির খাটিয়া হাসপাতালের 'বেডের' মত পাশাপাশি পাতা রয়েছে। শ্যামল ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়াল। চেয়ার ক'খানির কোনটার হাতল ভাঙ্গা—কোনটার বা পাই নেই। টেবিলে, কাচের দোয়াতদানি অক্ষত, কিন্তু দোয়াতে এক ফোটা কালি নেই।

দেয়ালে বইএর রেকগুলোর দিকে তার দৃষ্টি পড়ল। রেক কটা বই এ ভর্ত্তি ছিল। কিন্তু এখন অধিকাংশ রেকই শূন্য। নিঃশ্বাস ছেড়ে শ্যামল নীচের রেক থেকে একখানি বই তুলে নিয়ে দেখতে লাগল।

পেছন দিকে একখানি খাটিয়ায় চাদর মুড়ি দিয়ে বৈকুণ্ঠ শুয়েছিল। মুখ থেকে চাদর না নামিয়েই সে কহিল ; হ্যাঁ গা বলি এটা কি ভদ্দর নোকের কাজ হচ্ছে বাবু ?

বৈকুণ্ঠের গলা শুনে শ্যামল খুসী হল। বৈকুণ্ঠ কিন্তু শ্যামলকে দেখতে পায়নি। শ্যামলের পেছনটা চাদরের ফাঁকে দেখে, সে ভেবেছিল আর কেউ ঘরে ঢুকেছে।

বৈকুণ্ঠ বলতে লাগল ; রোজ রাত্তিরে এসে ত বেমালুম বই সরাচ্ছ। বলি দাদাবাবু ফিরে এলে আমি কি জবাব দোব এর, এঁ্যা ?

বলতে বলতে বৈকুণ্ঠ দেয়ালের দিকে পাশ ফিরল। গজ গজ করতে লাগল সে, তা আমিই বা এর কি প্রতিকার করি। এত আর পেতল কাঁসা সোনা দানা না যে, চোরকে থানায় নিয়ে যাব। বই চোর সব ভদ্দর নোক। আর বলতে কি ওসব কেতাব নোকে কোন সুখে যে চুরি করতে আসে তারাই জানে। আমার ত দেখেই মাথা ধরে যায়।

শ্যামল ফোঁড়ন দিয়ে বললে তা যা বলছ।

বৈকুণ্ঠ এবার চাদরের ভেতর থেকে চেঁচিয়ে উঠল, খুব যে সাধু সাজছ। আর একটু যদি চুপ করে থাকতাম ত বই কখানা নিয়ে দিব্যি খসে পড়তে।

শ্যামল বৈকুণ্ঠর খাটিয়ার পাশে এগিয়ে এল। বৈকুণ্ঠ পাশ ফিরে চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমাচ্ছে। শ্যামল বলল, এই হতভাগা, ওঠ্।

বৈকুণ্ঠ এবার চাদরের ভেতর থেকে বিরক্তস্বরে বললে, আঃ জ্বালিও না বলছি বাবু, এখন আমি উঠতে পারবনি।

শ্যামল বললে চাদরটা একবার মুখ থেকে সরাও না বাপু।

কেন মিছিমিছি ঝামেলা করছ। বৈকণ্ঠ বললে, তুমি যেই হও, এখন আমি চা করতে পারবনি। শ্যামল বললে, তা আর পারবি কেন।

বৈকুণ্ঠ চাদরের ভেতর থেকে ঘুমজড়িত স্বরে বললে, আমি এখন পারবনি বাপু। রাত্তিরে তোমাদের জ্বালায় একটু যে ঘুমোব তার ও কি জো আছে। রাত বারোটায় এসে হুকুম করলে, চা কর।

রাত বারোটা না তেরটা বেজে গেছে। বলে শ্যামল একটানে তার গায়ের চাদর তুলে নিল। চোখ মেলে তাকিয়ে এক মুহূর্ত্ত বৈকুণ্ঠর মুখে কথা সরে না। বিস্ময়ে আনন্দে তার চোখে জল এসে পড়ে।

দাদাবাবু! তুমি! তার স্বর অবরুদ্ধ, চোখের পাতা ভেজা। কিছুদিন আগে উজ্জ্বলার মুখে সে শুনেছিল, শ্যামলের বেরিয়ে আসার সময় হয়েছে। কিন্তু কথাটা সে.বিশ্বাস করেনি। কারণ এর আগেও উজ্জ্বলা তাকে দু একবার ফাঁকি দিয়েছে। যখনই সে চলে যেতে চেয়েছে, শ্যামল শীগগির বেরিয়ে আসছে বলে, উজ্জ্বলা তাকে আটকে রেখেছে। দাদাবাবুর সঙ্গে দেখা না করে কি বৈকুণ্ঠর চলে যাওয়া উচিত?

দাদাবাবু! তুমি! কম্পিতস্বরে বৈকুণ্ঠ বললে।

শ্যামল ছোটবেলার মত বৈকুণ্ঠর চুল ধরে টেনে খাটিয়া থেকে নামিয়ে দিয়ে বললে, পাজি ছুঁচো কোথাকার। সন্ধ্যারাতেই চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমানো হচ্ছে। তারপর নিজে বৈকুণ্ঠর পরিত্যক্ত বিছানায় শুয়ে পড়ল। বৈকুণ্ঠ হা হা করে উঠল, বললে, ঐ নোংরা বিছানায় শুয়ো না বাবু. আমি তোমার বিছানা পেতে দিচ্ছি।

আমার বিছানা? শ্যামল উদাস স্বরে বললে, সে কোথায়?

বৈকুণ্ঠ বললে, গুদাম ঘরে তুলে রেখেছি না। এখুনি নিয়ে আসছি।

বৈকুণ্ঠ শ্যামলের শোবার ঘর খুলে পরিষ্কার বিছানা পেতে দিল। বললে, আজ যে তোমার বেরোবার দিন দিদিমনি বলেছেন, কিন্তু আমি বিশ্বাস করিনি, দাদাবাবু!

শ্যামল সে কথার উত্তর না দিয়ে বললে, তুই যে আজো বেঁচে আছিস

এই আমার ভাগ্য। একগাল হেসে বৈকুণ্ঠ বললে, তোমাকে সংসারী না দেখে বৈকুণ্ঠ মরবে না, দাদাবাবু।

তবে তুই অমর। শ্যামল বললে, আচ্ছা বৈকুণ্ঠ সত্যি করে বলত, এই সাতবছর বিনে মাইনেয় কেন তুই এখানে পড়ে আছিস?

মাইনে অবশ্য বৈকুণ্ঠ পায় না। কিন্তু উজ্জ্বলার কাছ থেকে দরকার মত মাঝে মাঝে সে টাকা নিয়ে বাড়ী পাঠিয়েছে। কথাটা শ্যামলের কাছে গোপন রাখবে বলে, উজ্জ্বলার নিকট প্রতিজ্ঞা করেছিল বৈকুণ্ঠ। আমতা আমতা ক'রে বললে, তা সাত বছরেরই ত মাইনে। বেরিয়ে এসে তুমি সুদে আসলে কড়ায় গণ্ডায় পুষিয়ে দেবে সে কথা কি আর আমি জানিনে?

শ্যামল হেসে বললে, তাই নাকি। তবে ঐ আনন্দেই বেঁচে থাক।

সে বিছানায় পাশ ফিরল। বৈকুণ্ঠ বললে, ঘুমিয়ো না যেন। আমি খিচুড়ী রাঁধছি। তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে।

আমার জন্য? শ্যামল বললে, আমি কিছু খাব না বৈকণ্ঠ। ও-বেলা উজ্জ্বলার বাড়ীতে খেয়ে এসেছি।

বৈকুণ্ঠ বললে, ও বেলা খেয়েছ, নিশ্চয়ই তোমার খিধে পেয়েছে।

খিধে পেলে তোকে ত বলতামই। শ্যামল হেসে বললে, যা এখন ঝামেলা করিসনি। আমি একটু ঘুমোব।

বৈকুণ্ঠ বাইরে থেকে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছিল। শ্যামল পিছু ডাকল, শোন্। খুব ভোরে আমাকে ডেকে দিস। সাতটার গাড়ী ধরতে হবে আমাকে; সোনাপুরে যাব।

পাঁচ

সোনাপুর গ্রামে এইমাত্র ভোর হল। সদ্য ঝাঁট দেওয়া ঝকঝকে পরিষ্কার উঠান। একপাশে গোয়ালে গোরু গুলো বাঁধা। কুঞ্জদাদু

তাদের সামনে খড় ভাগ করে দিলে। তারপর কাঁধের গামছা দিয়ে গোরু গুলোর গায়ের ধুলোবালি সস্নেহে ঝাড়তে লাগল।

আমবাগান থেকে ভোরের পাখীদের কলকাকলি, সম্মিলিত ঐক্যতান বাদনের মত সারা বাড়ীটা মুখর করে তুলেছে। ভোরের কলকাকলির সঙ্গে গ্রাম্য পরিবেশের একটা গভীর সম্বন্ধ আছে। আস্তে আস্তে রোদ উঠে, পাখীদের কণ্ঠ থেমে আসে। আহার অন্বেষণে তারা বেরিয়ে পড়ে।

কুঞ্জ কাছে আসতেই বাছুরটা ডাকতে সুরু করল। সঙ্গে সঙ্গে তার মা ও 'হাম্বা' 'হাম্বা' ডাকতে লাগল। কুঞ্জ বললে, অত ব্যস্ত হচ্ছিস কেন? শেফালি এখুনি আসছে।

সদ্যস্নাত তের চৌদ্দ বছরের মেয়ে শেফালি. কলসিভর্ত্তি জল নিয়ে উঠানে পা দিতেই বাছুরটা আবার ডাকতে আরম্ভ করে! কলসি নিয়ে রান্নাঘরের দাওয়ায় উঠতে উঠতে শেফালি বললে, বাপ রে বাপ। ভোর হতে না হতেই চেঁচামেচি সুরু হয়েছে।

চান করলি ত? কুঞ্জদাদু বললে। অত ভোরে চান করবার কি দরকার ছিল শুনি! পর্শু না তোর জ্বর এসেছিল!

শেফালি রান্নাঘর থেকে বললে, জ্বর আর আসবে না, দাদু।

কুঞ্জদাদু বললে, তা ত আসবে না, এবার জ্বর এলে কিন্তু সাত দিন ভাত বন্ধ। শেফালি দুধের ভাড়টা নিয়ে গোয়ালের দিকে যেতে যেতে বললে, রাজী। কুঞ্জদাদু বললে, ভাবছিস আমি মাঠে চলে গেলে লুকিয়ে লুকিয়ে হাড়ি থেকে মেরে দিবি? উঁহু, রান্নাঘরে চাবি দিয়ে যাব। তাই দিয়ো। শেফালি তার উজ্জ্বল সুন্দর দাঁত বের করে দাদুর দিকে তাকিয়ে বারেক হাসল। তারপর চাঁপার কলির মত আঙুল দিয়ে দুধ দুইতে লাগল।

শরত কাল। মাঠে এখন কাজকর্ম নেই। সোনাপুরে জীবনের গতি মন্থর। কুঞ্জদাদুর ক্ষেতিচাকর বাদশা মিঞা হুকো টানতে টানতে এল। কুঞ্জদাদু বললে, পূবের মাঠের জমিটার জল বেধে রেখেছিলে ত বাদশা

হুকোয় দীর্ঘ টান দিয়ে একগাল ধোঁয়া নিঃসরণ করে, বাদশা বললে, বাদশা মিঞা কখনো কাজের কথা ভুলে? কাল তুমি যখন বলেল, তখুনি আলটা বেধে রাখলাম। কিন্তু হবে কি রায়মশাই? এখন ওদিক থেকে আসবার সময় দেখলাম জমিতে একটুও জল নেই। রাত্তিরে নীচের জমিতে সব জল নামিয়ে নিয়েছে সরিয়ত। বাদশা আবার হুকো টানতে লাগল।

না, কুঞ্জদাদু বিরক্ত স্বরে বললে, রোজ রোজ জমির জল চুরি করে নামিয়ে নেবে, এ আর কাঁহাতক সহ্য করা যায়?

বাদশা বললে, জানে রায় মশাই ভাল লোক, দাঙ্গাফ্যাসদ করবে না! মজিদ খানের জমি থেকে একদিন জল চুরি করুক না। লালে লাল হয়ে উঠবে জমির জল!

থাকগে, কুঞ্জদাদু বললে, যা করবার আমি করব'খন। গোরু কটাকে নিয়ে তুমি বটতলার দিকে চলে যাও ত বাদশা। ওদিকে ঘাস আছে, বেশ লম্বা ঘাস, আমি কাল দেখে এসেছি।

শেফালির দুধ দোয়ানো হয়ে গেছল। উঠে দুধের ভাঁড় একপাশে রেখে সে বাছুরটাকে ছেড়ে দিল। কুঞ্জ দূর থেকে ভাড়টা লক্ষ্য করে বললে, দুধ আজো কম হল দেখছি। ইচ্ছে করেই তুই কম নিচ্ছিস নাকি?

শেফালি ভাঁড় নিয়ে রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে মাথা নাড়ল।

কুঞ্জদাদু বাদশার দিকে তাকিয়ে বললে, শেফালিদিদির আমার বাছুরের জন্য মায়াটা দেখলে ত। আমি শুধু ভাবি দিদির যখন নিজের বাছুর হবে তখন যে কি করবে!

বাদশা বললে, গোরু বছুরের জন্য যার দরদ নাই, নিজের বাচ্চার জন্য ও তার দরদ নেই। বলে সে হাসতে লাগল, হা হা হা। কুঞ্জদাদুও সে হাসীতে যোগ দিল।

....দুপুরবেলা গল্পের বই ফেরত দিতে শেফালি পুতুলদের বাড়ী গেছে। রমেশবাবুর মেয়ে পুতুলের সঙ্গে শেফালির গলায় গলায় ভাব। কর্ম্মজীবনে রমেশবাবু কোন সরকারী লাইব্রেরীর সহকারী লাইব্রেরীয়ান ছিল। তাই পেন্সন নিয়ে ও, পুঁথিপত্র খবরের কাগজ নিয়ে নাড়া-চাড়া করতে রমেশবাবু ভালবাসে। কলকাতা থেকে ডাকে তার বই পত্র আসে। তা ছাড়া একখানি বাংলা দৈনিক ও রমেশবাবু নিয়মিত রাখে। সোনাপুরে ঐ একখানি কাগজই আসে। যেদিন কাগজে কোন উল্লেখ-যোগ্য খবর থাকে, রমেশবাবু গাঁয়ের পাচজনকে ডেকে খবরটা পড়ে শোনায়।

কুঞ্জদাদুর জন্য শেফালি মঝে মাঝে কাগজ চেয়ে নিয়ে যেত। কাগজ-খানি হস্তান্তরিত করবার সময় রমেশবাবু রোজই বলত, ফিরিয়ে দিতে ভুলো না কিন্তু, আমার এখনো পড়া হয়নি। তিনদিনের পুরানো কাগজ হলেও ঐ একই কথা বলবে রমেশবাবু।

রমেশবাবুর আর একটি অভ্যাস ছিল, যে সব খবর ছোট হরফে দেওয়া থাকত, সেগুলোর নীচে লাল পেন্সিল দিয়ে দাগ কাটা। অভ্যাস মত আজও রমেশবাবু কাগজে লাল-নীল পেনসিল দিয়ে দাগ কাটাছিল। পুতুল ও শেফালি পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। রমেশবাবু বললে, অমন একটা খবর ছাপলে কি না এমন হরফে যাতে চোখে না পড়ে।

কী খবর বাবা? পুতুল প্রশ্ন করল।

শুনবি? রমেশবাবু বললে; দাঁড়া, আমি পড়ছি। তারপর কাগজখানি নাকের সামনে তুলে ধরে পড়তে লাগল;

"কলকাতা ২০শে সেপ্টেম্বর। রাজবন্দীর মুক্তি। দীর্ঘ সাতবছর কারাবাসের পর রাজবন্দী শ্যামল বসু অদ্য প্রেসিডেন্সি জেল হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন।" শ্যামলদা, শেফালি উত্তেজিতস্বরে বললে, শ্যামলদা জেল থেকে মুক্তি পেয়েছেন!

শ্যামলদা! রমেশবাবু চোখের চশমা কপালে তুলে শেফালির দিকে তাকিয়ে বললে, কি বলছিস তুই পাগলি? রাজবন্দী শ্যামল তোর দাদা হল কি করে?

আটবছর আগেকার শ্যামলের মুখখানি শেফালির স্মৃতিপটে ঝাপসা ঘোলাটে হয়ে আসছিল। কিন্তু মুখচ্ছবি যতই আবছা হয়ে আসুক, শেফালি তাকে ভুলেনি। কুঞ্জদাদুকে প্রায়ই সে জিজ্ঞাস করত, শ্যামলদা কবে আসবে দাদু? কুঞ্জদাদু বলত, আসবে—ছুটী পেলেই আসবে। তারপর অবশ্য কুঞ্জদাদুর মুখে সে সবই শুনেছিল। স্বদেশী করার জন্য, দেশকে ভালবাসার অপরাধে, শ্যামলের সাতবছর জেল হয়েছে। ছোট্ট শেফালি প্রশ্ন করেছিল, দেশ কে দাদু? দেশ, কুঞ্জদাদু উত্তর দিয়েছিল, দেশ—দেশমানে দেশের লোক; তুমি আমি, গরীবদুঃখী। সবকথা না বুঝলেও, ছোট্ট শেফালি একথা বুঝেছিল, শ্যামলকে ওরা অবিচার করে আটকে রেখেছে।

শ্যামল মুক্তি পেয়েছিল খবরটা শুনে শেফালির চোখে জল এসে পড়েছে। শ্যামলদা ছুটী পেয়েছেন! শেফালি অশ্রুসিক্ত স্বরে বললে,। রমেশবাবু চশমাটা কপাল থেকে নামিয়ে বললে, শ্যামল বোস যে কুঞ্জবাবুর আত্মীয় তা ত জানতাম না!

শেফালি আর দাঁড়ল না। বাড়ীর দিকে ছুটল। খববটা এখুনি কুঞ্জদাদুকে বলবে সে। শ্যামলদা মুক্তি পেয়েছে। রমেশবাবু পিছু ডাকল, বললে, কাগজটা নিয়ে যা শেফালি। কুঞ্জবাবু পড়বেন'খন। শেফালি ফিরে এসে কাগজখানি তুলে নিয়ে আবার রাস্তার দিকে ছুটতে লাগল। সহসা রমেশবাবুর মনে পড়ল। তাই ত কাগজখানি ফিরিয়ে দেওয়ায় কথাটা শেফালিকে বলতে ভুল হয়ে গেছে সে। শেফালি ও শেফালি। রমেশবাবু ডাকতে লাগল। কিন্তু শেফালি ততক্ষণ পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

শোবারঘরের সামনে প্রশস্ত বারান্দায় একটী মোড়া পেতে বসে

কুঞ্জদাদু বাঁশবেতের ঝাকা তৈরী করছিল। দাদু দাদু। বাইরের রাস্তা থেকে চেঁচাতে চেঁচাতে শেফালি ছুটে এসে দাওয়ায় উঠল।

কুঞ্জদাদু বললে, কি হ'ল দিদি। খুব একটা মজার ব্যাপার হয়েছে বুঝি? শেফালি উত্তেজিতস্বরে বলতে লাগল, দাদু, শ্যামলদাকে জেল থেকে ছেড়ে দিয়েছে।

শ্যামল মুক্তি পেয়েছে? কুঞ্জদাদুর হাতের কাজ বন্ধ হয়ে এল। শেফালির দিকে তাকিয়ে অবিশ্বাসের স্বরে বললে, কে বললে তোকে?

শেফালি কাগজখানি কুঞ্জদাদুর সামনে তুলে ধরে বললে, এই যে কাগজে লিখেছে, দাদু।

কাগজে লিখেছে, সত্যি বলছিস দিদি? কুঞ্জদাদু কম্পিত স্বরে বললে। তারপর কাগজখানি শেফালির হাত থেকে টেনে নিয়ে ভাঁজ খুলতে লাগল। কোথায় কোন পৃষ্ঠায় লিখেছে? শেফালি বললে, আমার কাছে দাও, আমি বের করছি। না না আমিই বের করছি। কুঞ্জদাদু বললে।

শেফালি বললে, শ্যামলদা জেল থেকে বেরিয়ে এসেছে শুনে বুঝি, তোমার চোখ ভাল হয়ে গেল দাদু? চশমা না পরেই পড়তে পারবে? এতক্ষণে কুঞ্জদাদুর মনে পড়ল, চোখে তার চশমা নেই। কিন্তু শেফালির কথায় অপ্রস্তুত হল না কুঞ্জদাদু, সামনে পথের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে বললে, দেখছি বই কি দিদি। এ তোমার খবরের কাগজের ছাপানো হরফ না। কিন্তু তার চেয়ে ও বেশী। কি দেখছি জানিস? দেখছি শ্যামল জেলের ফটক দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে আসছে। সামনে রাস্তায়, ফুলের মালা হাতে অনেকলোক তার জন্য অপেক্ষা করছে।

শেফালি বিস্মিতদৃষ্টিতে এক মুহূর্ত দাদুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। দাদুকে এমন করে বলতে সে কোনদিন শোনেনি; কাগজখানি হাতে করে কুঞ্জদাদু একমুহূর্ত্ত পথের দিকে তাকিয়ে রইল। অনেক কথাই বুঝি তার মনে পড়ে। কৃষ্ণকান্তির কথা, শ্যামলের মার কথা, ছোট্ট শ্যামলের কথা।

—কি ভাবছ দাদু? শেফালি বললে।

—না, কিছুই ভাবছি নে। কুঞ্জদাদু উদাসস্বরে বললে, শ্যামলের মুখখানি মনে পড়ছে শুধু।

তোমার চশমাটা আনব দাদু? শেফালি বললে।

চশমা! কুঞ্জদাদু বললে, সে কোথায় রেখেছি খুঁজে দেখতে হবে। না অত দেরী সইবে না, ভাই। খবরটা তুই পড়, আমি শুনি। চশমা লাগিয়ে আমি আর একবার পড়ব'খন।

শুধু একবার নয়, কুঞ্জদাদু খবরটা এতবার পড়লে যে, শেষ পর্য্যন্ত সংবাদটার সব ক'লাইন তার মুখস্থ হয়ে গেল। শ্যামলকে দাদু কত ভালবাসে। শেফালি আজ যেন নতুন করে জনাল।

—চান করবে না দাদু? শেফালি বললে অবশেষে। রান্না আমার হয়ে গেছে, অনেকক্ষণ।

—যাচ্ছি রে যাচ্ছি! কুঞ্জদাদু বললে, শ্যামল আমার কেমন আছে কে জানে! ওকে একবার দেখতে ভারী ইচ্ছে হয়।

এক মুহূর্ত্ত কি ভেবে বললে, শেফলি, যাবি তুই আমার সঙ্গে?

—কোথায় দাদু? শেফালি প্রশ্ন করল।

কুঞ্জদাদু বললে, কলকাতায় শ্যামলকে দেখতে যাব।

শ্যামলদাকে দেখবার ইচ্ছে কুঞ্জদাদুর চেয়ে শেফালির কিছু কম ছিল না। এক কথায় রাজি হল সে। ঠিক হল বাদশা মিঞাকে বাড়ীতে পাহারাদার রেখে রাত নটায় গাড়ীতে তারা কলকাতা রওয়ানা হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের আর যেতে হল না। দুপুর বেলা শ্যামল এল। রান্না ঘরের দাওয়ায় খুঁটিতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে শেফালি শ্যামলের কথাই ভাবছিল। উঠানে বসে কুঞ্জদাদু হুকো টানছে। পুকুর ঘাটের রাস্তার দিকে দৃষ্টি পড়তেই শেফালি বললে, দাদু, শ্যামলদা এসেছে। শ্যামলদা! পরক্ষণেই কুঞ্জদাদুর উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করেই শেফালি পুকুর ঘাটের

দিকে ছুটল। কুঞ্জদাদু হুঁকো হাতে উঠে দাঁড়াল। শেফালি! শ্যামল দূর থেকেই শেফালিকে চিনতে পারে। নীচু হয়ে শেফালি শ্যামলেব পায়ের ধুলো মাথায় নিল। শ্যামল তার বিনুনী ধরে টেনে বললে, ও কি হচ্ছে? শেফালি দাঁড়াতেই বললে, ইস্, মাথায় খুব লম্বা হয়ে গেছিস দেখছি!

শেফালি বললে, সুটকেশটা আমার হাতে দাও শ্যামলদা। আর এক দিনের কথা শ্যামলের মনে পড়ে গেল। হেসে বললে, ভয়ানক ভারী, তুলতে পারবিনি।

শেফালি শ্যামলের হাত থেকে সুটকেশটা প্রায় কেড়েই নেয়। বললে; ছাই ভারী। দুজনে পাশাপাশি এগোতে লাগল। শ্যামল বললে, সেবার যখন এসেছিলাম সুটকেশটা তুই তুলতেই পারিসনি। শেফালি বললে, তখন যে ছোট ছিলাম, শ্যামলদা। শ্যামল বললে, এখন খুব বড় হয়ে গেছিস বুঝি?

কুঞ্জদাদু বাইরের বাড়ীর রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে। চোখে তার জল। শেফালি বারেক সেদিকে তাকিয়ে সুটকেশ নিয়ে ভেতরে গেল। শ্যাম! অবরুদ্ধ স্বরে কুঞ্জদাদু বললে, শ্যাম তুই এসেছিস!

শ্যামল বললে, জেল থেকে বেরিয়েই তোমার কাছে ছুটে এলাম, দাদু! তারা উঠানের দিকে যেতে লাগল। শ্যামল বললে, কেমন আছ দাদু? কুঞ্জদাদু বললে, আমি? আমি ভালই আছি, শ্যাম। কিন্তু নন্দা আর বেঁচে নেই, জানিস বোধ হয়। শ্যামল ব্যথিতস্বরে বললে, এ্যারেষ্ট হওয়ার দুদিন আগে তোমার সে চিঠি পেয়েছিলাম। কিন্তু উত্তর আর দিতে পারিনি। কুঞ্জদাদু বললে, কৃষ্ণকান্তি নেই, নন্দা নেই, কিন্তু আমি ঠিক বেঁচে আছি। সবল সুস্থ শরীর, সারাদিন মাঠে কাজ করেও ক্লান্তি আসে না। মাঝে মাঝে ভাবি;—সহসা তার মনে পড়ল, কিন্তু ঐ দ্যাখো, স্বার্থপরের মত নিজের দুঃখের পাঁচালি গাইতে সুরু করেছি, তোর কথা কিছুই জিজ্ঞেস করা হয়নি। আয়, ঘরে আয় আগে।

কুঞ্জদাদু ও শ্যামল মাঝখানের বড় ঘরটীতে, ফরাসে, তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে

বসল। দুপুর গড়িয়ে পড়ছিল। পশ্চিমের ঘর খানির ছায়া উঠানের মাঝামাঝি নেমে এসেছে। শেফালি এসে বললে, তোমার জন্য এখন চা করব শ্যামলদা, না এক্ষুণি ভাত খাবে? খাবার কিন্তু তৈরী। শ্যামল বললে, সে কি! আমি যে আসব সে কথা তোমরা জানতে না কি?

শেফালি বললে; হুঁ—জানতাম বই কি! না জানলে ভাত রাঁধলাম কি করে? কুঞ্জদাদু বললে, জানিস শ্যাম, শেফালি দিদির ভাণ্ডার আমার অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার। দু' একজন অতিথির জন্য ওকে কোনদিন হাঁড়ি চড়াতে দেখিনি।

শ্যামল স্মিত মুখে নীরবে মাথা নাড়ল, হ্যাঁ সে জানে। কুঞ্জদাদু বললে, কিন্তু শ্যাম, তুই না এলে আজ রাত নটার গাড়ীতে আমরা,—আমি আর শেফালি তোকে দেখতে কলকাতায় যেতাম, সব ঠিকঠাক হ'য়ে গেছল। সত্যি নাকি দাদু! শ্যামল বললে।

শেফালি দরজা থেকে বললে, তালে এখন চা খেয়ে কাজ নেই, না শ্যামলদা? শ্যামল বললে; থাক তবে। শেফালি বললে, কিন্তু এখন আর আমি তোমাদের বসতে দোব না। চান করে খেয়ে দেয়ে, তখন যত খুসী গল্প কর আমি কিছু বলব না।

কুঞ্জদাদু মুখ টিপে হেসে বললে, দেখছিস ভাই, আমার ছোট গিন্নীটির কী কড়া শাসন! যাঃ! বলে শেফালি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। শ্যামল বললে; শেফালি তাহলে রান্নাবান্না সব শিখে গেছে?

ঐ ত সব করছে, কুঞ্জদাদু বললে, কিন্তু আর এখানে বসে থাকা চলবে না, শ্যাম। একবার যখন বলে গেছে, এখুনি চানে না গেলে শেফালি দিদি বেজায় চটে যাবে!

খাওয়া দাওয়ার পর, শ্যামল ও কুঞ্জদাদু হলঘরের ফরাসে এসে বসল আবার। শ্যামল পান খায় না, পানের কৌটো থেকে মাঝে মাঝে এক আধ টুকরো সুপারি তুলে সে দাঁতে কাটছিল। কুঞ্জদাদু হুঁকো টান ছিল।

হুঁকোটা এক পাশে দেয়ালে ঠেস দিয়ে রেখে বললে; শ্যাম, সত্যি করে বলত কেমন আছিস তুই? তোর সব কথা জানবার জন্য, তোকে বুঝবার জন্য বড় ইচ্ছে করে। কিন্তু সবদিক দিয়েই তুই যে আমার নাগালের বাইরে, শ্যাম।

শ্যামল স্মিত মুখে বললে, দাদু! আমি তোমাদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে নই—আমি তোমাদেরই একজন।

তারপর এক মুহূর্ত্ত চুপ করে কি ভাবতে লাগল। কুঞ্জদাদু বললে; বল শ্যাম! বলবার তো কিছু নেই, দাদু। শ্যামল বলতে লাগল : একটা কথা ছাড়া। সেই কথাটী এই যে, দেশকে স্বাধীন করবার জন্য, সারা জীবনটাও যদি কারা প্রাচীরের অন্ধকারে কাটাতে হয়—কোন খেদ করব না, দাদু।

কুঞ্জদাদু কি ভেবে বললে, জেলে স্বদেশীদের উপর খুব অত্যাচার করে, না শ্যাম? শ্যামল উদাস স্বরে বললে, করুক না অত্যাচার, কত করবে। এই অত্যাচারের প্রতিক্রিয়ার হাত ইংরাজ এড়াতে পারবে না, দাদু।

কুঞ্জদাদু বললে, হ্যাঁ রে খাওয়া দাওয়ার নিশ্চয়ই খুব অসুবিধে? কী খেতে দেয় তোদের? শ্যামল হেসে বললে, যাবজ্জীবেৎ, লপ্সী পিবেৎ। লপ্সী আর কচুশাক এই হচ্ছে আমাদের খাদ্য।

এই সব ছেলেরা হাসিমুখে অত কষ্ট সহ্য করছে! কুঞ্জদাদু অবাক হয়ে ভাবে। আস্তে আস্তে বলে, মারধর অত্যাচার, আধপেটা খেয়ে থাকা;—এমন করে তোরা কদিন বাঁচবি?

শ্যামল বললে, হ্যাঁ, সেকথা ঠিক। অনেকেই সহ্য করতে পারে না। অকালে ঝরে পড়ে।

হ্যাঁ রে শ্যাম, কুঞ্জদাদু বললে, জেলে কি না গেলেই নয় রে?

জেল? শ্যামল বললে, জেল কাকে বলছ দাদু? ও ত শ্বশুরবাড়ী। খাওয়া শোওয়ার অমন নিশ্চিন্ত আশ্রয় কটা ভারতবাসীর আছে?

তার পর উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারি করতে লাগল। আর জেলই যদি বল,

ইংরাজরাজত্বে গোটা ভারতবর্ষটাই ত একটা জেলখানা, দাদু! তোমার, আমার, ভারতবাসীর কোন স্বাধীনতাই নেই। না আছে খাওয়া পরার, না আছে বেঁচে থাকার। আজ যদি বাড়ীতে ডাকাত পড়ে, আত্মরক্ষা করবার জন্য একটা বন্দুকের লাইসেন্স পর্য্যন্ত তুমি পাবে না। দাসত্বের বেড়াজালে বাধা পড়ে আমাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি সব ধ্বংস হতে চলেছে। কিন্তু আর বেশীদিন নয় দাদু! আমরা সে জাল ছিড়বই এবার।

শ্যামলের মুখের দিকে তাকিয়ে কুঞ্জদাদু কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর কতকটা যেন আপনমনেই বলতে লাগল, আজকালকার ছেলেদের সবকথা বুঝি না, কিন্তু একথা বুঝি, আত্মত্যাগ ও মহত্বে তোবা আমাদের অনেক উঁচুতে।

শ্যামল মৃদুহেসে বললে; না দাদু, কথাটা ঠিক তা নয়। চিরকালই একদল লোক জন্মেছে সবদিক দিয়ে যারা সাধারণের চাইতে অগ্রসর। সাধারণের পথ-প্রদর্শক। সেযুগের ও এযুগের কর্ম্মীদের ভেতর তফাত শুধু এই যে,— এরা রাজনৈতিক মুক্তিটাকেই ধর্ম্ম অর্থ ও মোক্ষলাভের প্রাথমিক সোপান বলে জেনেছে। তাই এরা পরমার্থিক মুক্তির জন্য যোগী না সেজে, পার্থিব মুক্তির জন্য—অত্যাচারী শোষকের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করবার জন্য অম্লানবদনে সব নির্য্যাতন, সকল অত্যাচার সহ্য করে। ফাঁসিগাছে হাসিমুখে জীবন দান করে। কিন্তু এসব কথা এখন থাক দাদু। আমি একটু ঘুমোব, এবার। রাত্তিরে ট্রেনে মোটেই ঘুম হয়নি।

কুঞ্জদাদু বললে, ঘুমোবিত বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়না। ও-ঘরে শেফালি তোর বিছানা পেতে দিয়েছে।

শ্যামল হাই তুলে উঠে দাঁড়াল। কুঞ্জদাদু ও তার পিছু পিছু উঠল। এক্ষুণি তাকে মাঠে যেতে হবে।

আকাশচুম্বী দাঁত বের করা বীভৎস কারা প্রাচীরের অন্তরালে সাত-বছর কাটিয়ে সোনাপুরের প্রাকৃতিক আবেষ্টনী শ্যামলের আরো ভাল

জাগে এবার। গোচারণের খোলামাঠ ও সবুজ ধানক্ষেত; শরতের গাছপালা প্রাণের প্রাচুর্য্যে গাঢ় সবুজ। সারা সকাল পাতার আড়ালে এখানে ওখানে নাম না জানা পাখীর গান; তারপর শান্ত সমাহিত দুপুর। হ্যাঁ, এটা প্রাণভরে উপভোগ করতে শ্যামল এবার ছুটে এসেছে গ্রামে। ক্লান্ত শ্যামল নতুন উদ্যমে কাজে নামবার আগে কদিন পরিপূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণ করবে। বক্তৃতা নয়, রাজনীতি নয়, পুলিশের সাথে লুকোচুরি নয়—কদিন পরিপূর্ণ অবসর।

সকালবেলা। শেফালি ঘরে নেই। কুঞ্জদাদু উঠানের কোণে বসে কাঠ কাটছে। শ্যামল বিছানা থেকে উঠে হাই তুলতে তুলতে আস্তে আস্তে দাওয়ায় বেরিয়ে এল।

ঘুম ভাঙ্গল? উঠান থেকে কুঞ্জদাদু স্মিতমুখে বললে।

শ্যামল বললে, ঘুম অনেকক্ষণ ভেঙ্গেছে দাদু। কিন্তু অত ভোরে উঠে আর কি করি, তাই শুয়েই ছিলাম।

কুঞ্জদাদু বললে; তোমার পক্ষে এখন একটু বেশী করে ঘুমানোই ভাল। ঘুমের মত বিশ্রাম আর নেই।

অবশ্য যদি ভাল ঘুম হয়। শ্যামল ফোঁড়ন দিল।

সে কথা ঠিক, সে কথা ঠিক। কুঞ্জদাদু বললে। শেফালি পুকুরঘাটে গেছে বোধ হয়। এসে তোমাকে চা দেবে। যখন যা দরকার, যা খেতে ইচ্ছে করে, চেয়ে চিন্তে খাবে, শ্যাম!

শ্যামল স্মিতমুখে বললে; না চাইব না।

কুঞ্জদাদু হাসলে। বললে, আর এ-ও বলি, শেফালি তোমাকে চাওয়ার সুযোগ দেবে না কখনো। এসব দিক দিয়ে ওর লক্ষ্য আছে শ্যাম।

বাইরের বাড়ীর পথ। দুপাশে গাছপালার শ্যামলিমা প্রাণভরে উপভোগ করতে করতে শ্যামল এগিয়ে চলেছে। খানিক দূরে পথটা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে একদিক অমবাগানের দিকে চলে গেছে। অন্যমনস্ক শ্যামল আমবাগানের

দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। সহসা কোকিল ডেকে উঠতেই, সে উর্দ্ধে তাকিয়ে থমকে দাঁড়াল। আমগাছের ডালে পাতার আড়ালে বসে কোকিল ডাকছিল; কু-হুঁ-উ, কু-হুঁ-উ! কোকিলের ডাক শ্যামল এর আগে কখনো শোনেনি, এমন নয়। কিন্তু আজ যেন সে নতুন করে কোকিলের গান শুনল। শ্যামল তার সমগ্র সত্ত্বা দিয়ে একণ্ঠ অনুভব করল। কিছু বা আনন্দের, কিছু বা বিষাদের, আশ্চর্য্য এক অনুভূতি। না, না, শ্যমল ভাবল বিষাদের নয়—আনন্দের, এ অনুভূতি পরিপূর্ণ আনন্দের। পরিষ্কার নীলাভ উজ্জ্বল আকাশে সাদা মেঘেরা পাল তুলে ভেসে চলেছে। মাথার উপর গাছের ডালে বসে কোকিল ডাকছে। মুগ্ধ শ্যামল গাছের ডালে উপবিষ্ট এই মধুকণ্ঠী জীবটিকে যখন খুঁজে বেড়াচ্ছিল, তার সামনে হাত কয়েক দূরে আর একটি কোকিল ডেকে উঠল কু-হু-উ! কু-হু-উ!

কিন্তু ও কোকিল নয়। শেফালি গ্রাম থেকে সে পথ দিয়ে ফিরছিল। শ্যামল উপরে তাকিয়েছিল বলে, শেফালিকে প্রথমে দেখতে পায়নি। শেফালি কোকিলটাকে অনুকরণ করে উঠল: কু-হুঁ উ, কু-হুঁ-উ। চমকে উঠে শ্যামল ফিরে তাকাল। সামনে দাঁড়িয়ে শেফালি হাসছে। শ্যামল বললে, ও তুমি! আমি ভেবেছিলাম কি জান? ভেবেছিলাম সত্যি সত্যিই বুঝি কোকিল আমার পাশে উড়ে এল।

শেফালি বললে; কিন্তু চোখ ফিরিয়ে দেখলে, কোকিল না কাক।

দূর! শ্যামল বললে, কাক হতে যাবে কেন তুমি। কিন্তু এই সকালবেলা কোথায় বেরিয়েছিলে বলত শেফালি?

তারপর শেফালির হাতের দিকে দৃষ্টি পড়তেই বললে; হাতে ওটা কি? ডিম, শেফালি বললে, তোমার জন্য অছিমুদ্দির বাড়ী থেকে দুটো ডিম নিয়ে এলাম, চায়ের সঙ্গে হাফ বয়েল' খাবে বলে। টাটকা ডিম। শ্যামল বললে, টাটকা ডিমের হাফবয়েল! দুঃখী ভাইকে দুদিনেই তুমি মোটা না করে ছাড়বে না দেখছি!

বয়ে গেছে আমার তোমাকে মোটা করতে! শেফালি বললে।

শ্যামল হেসে বললে, বয়েত যায়নি, কিন্তু আমাকে কী খাওয়াবে সারাদিন তোমার ঐ এক ভাবনা কেন বোন? পিঠে, চিড়ে, ঘরের তৈরী সন্দেশ, গাছের ডাব, পুকুরের মাছ, মায় টাটকা ডিমের হাফ্‌বয়েল। সত্যি বলছি শেফালি, বলতে বলতে শ্যামলের স্বর ভিজে এল; আমার নিজের বোন থাকলেও সে অত করত না।

এক মুহূর্ত্ত মাথা নীচু করে শেফালি কি ভাবল। তারপর আস্তে আস্তে বললে, দুদিন না হয় পরের বোনের একটু অত্যাচার সইলে, শ্যামলদা!

এগিয়ে এসে শ্যামল তার বিনুনী ধরে টেনে বললে, খুব যে কথা শিখেছিস, এবার?

উঃ লাগে! শেফালি ভুরু কুঁচকে বললে, ছাড় শ্যামলদা! ছাড় বলছি! শ্যামল শেফালির বিনুনী ছেড়ে দিয়ে বললে, লাগছিল না হাতী।

শেফালি ভুরু কুঁচকে বললে, কী দুষ্টু তুমি শ্যামলদা!

পাশ দিয়ে সরু সুতোর মত পায়ে চলা অস্পষ্ট পথরেখা আমবাগানের মাঝখানে চলে গেছে। শ্যামল অন্যমনস্ক স্বরে বললে, আমি বুঝি দুষ্টু?

ফিক করে হেসে শেফালি এবার আমবাগানে ছুটে গেল। পিছু ডাকল শ্যামল; শেফালি, ও শেফালি শোন।

আমবাগানের মাঝখানে একটী উঁচু মাটীর ঢিবি। সরু পথ-রেখা ঢিবির উপর দিয়ে উঠে অন্যপাশে নেমে আমবাগানের ওপাশে অদৃশ্য হয়ে গেছে। ঢিবিটার উপর এসে শেফালি দাঁড়াল। আশে পাশে দু'একটা ঝোপ ঝাড়। এ যায়গাটা শেফালির খুব প্রিয়। এখানে দাঁড়িয়ে বুনোফুলের গন্ধ নিতে ওর ভাল লাগে। এদিক দিয়ে যেতে যেতে শেফালি রোজই ঢিবিটার উপর থমকে দাঁড়ায়। বুনোফুলের গন্ধ ভেসে আসে বাতাসে। আকাশে একটুকরো মেঘ পাল তুলে দাঁড়িয়ে থাকে।

শ্যামল আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে শেফালির পাশে, ঢিবির উপর দাঁড়াল।

কুঞ্জদাদুর মস্তবড় আমবাগান। বিশালাকার আমগাছগুলো, এক একটা অনেকখানি যায়গা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। শ্যামল সেদিকে তাকিয়ে দেখছিল। শেফালি বললে, কি দেখছ শ্যাললদা ?

শ্যামল বললে, আমগাছ ত না যেন এক-একটা অশ্বত্থগাছ। রাত্তিরে ওপথ দিয়ে যেতে নিশ্চয়ই তোর ভয় লাগে ?

যাও ! শেফালি মুখভঙ্গী করে বললে, ভয় করব কাকে ?

শ্যামল শেফালির কথায় খুসী হল। বললে, সত্যিই ত ভয়ের কি আছে। কিন্তু সত্যি বলছি শেফালি তোর জন্য আমার ভাবনার শেষ নেই।

কেন শ্যামলদা ? শেফালি প্রশ্ন করল।

শ্যামল বললে, কুঞ্জদাদুর বয়স হয়েছে। চিরদিন ত তিনি তোকে আগলে রাখতে পারবেনা, শেফালি। মেয়েছেলে হয়ে জন্ম নিয়েছিস, আশ্রয়ের জন্য, নির্ভরের জন্য পুরুষের উপর তোকে নির্ভর করতে হবে।

শেফালি উত্তর দিল না। মাথা নীচু করে একটা ঝোপ থেকে পাতা ছিঁড়তে লাগল। শ্যামল বললে, একটা মাত্র উপায় আছে বোন। লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়ানো। তবেই আর তোকে পুরুষের মুখাপেক্ষী হতে হবে না।

শেফালির উত্তর শোনবার জন্য শ্যামল এক মুহূর্ত অপেক্ষা করল। কিন্তু শেফালি কিছুই বললে না। শ্যামল বলতে লাগল ; লেখাপড়া শিখে যেদিন তুই স্বাবলম্বী হতে পারবি, সেদিন আমার আর কোন ভাবনা থাকবে না তোর জন্য।

শেফালি কথা ঘুরিয়ে বললে, চল বাড়ী যাই। এতখানি বেলা হল, তোমার চা খাওয়াই হল না এখনো।

ঘুরে আমবাগানের মাঝখান দিয়ে পুকুর ঘাটের পথ ধরল তারা।

শ্যামল বললে, লেখাপড়া করতে বুঝি তোর মোটে ভাল লাগে না, শেফালি ?
শেফালি বললে, ভাল লাগবে না কেন। কিন্তু গাঁয়ে থেকে ত আর পড়া যায় না। পড়তে হলে সহরে যেতে হয়।

শ্যামল বললে, সহরেই ত যাবি। সহরে মেয়েদের কত বোর্ডিংইস্কুল রয়েছে। কোন বোড়িং ইস্কুলে তুইও ভর্ত্তি হবি। সেখানে,—বোড়িং ইস্কুলে কত মজা। শ্যামল তাকে উৎসাহিত করবার চেষ্টা করল। কিন্তু শেফালি উত্তর দিল না, এবারও।

কুঞ্জদাদুর কথা ভাবছিস ত? শ্যামল বারেক তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, তুই লেখাপড়া করতে সহুরে যাবি, দাদু কত খুসী হবেন।

একটা গাছের নীচ দিয়ে তারা যাচ্ছিল। শেফালি উপরে তাকিয়ে থমকে দাঁড়াল। বললে, বল ত শ্যামলদা এগাছটার নাম কি? শ্যামল মাথা চুলকাতে লাগল। বললে, দূর ছাই একটুও মনে পড়ছে না। সাতবছরে সব ভুলে গেছি।

সিঁদুরে পোড়া। শেফালি বললে;

তাই বল' শ্যামল বললে; সেবছর তুই আর আমি কত আম কুড়াতুম তোর মনে আছে?

শেফালি মাথা নাড়লে, বললে, মনে নেই বুঝি! সেই যে একদিন আমার অসুখ করেছিল, তুমি সিঁদুরেপোড়া গাছের আম এনে আমার বিছানার পাশে রেখেছিলে—সব আমার মনে আছে।

শ্যামল ঘটনাটা মনে করবার চেষ্টা করে বললে, তারপর, তারপর কি হয়েছিল যেন। ও, হ্যাঁ মনে পড়েছে, তুই গান গেয়েছিলি। শেফালি বললে; বা রে! আমি গেয়েছিলাম না তুমি গেয়েছিলে। শ্যামল বললে, তুই ও ত গেয়েছিলি!

শেফালি বললে, তুমি যেটুকু শিখিয়ে দিয়েছিলে সব ভুলে গেছি শ্যামলদা। এবার কিন্তু আমাদের সবাইকে গান শেখাতে হবে।

বাদশামিঞা একটা বড় রুই হাতে করে আসছিল, দেখেই শেফালি খুসীতে চেঁচিয়ে উঠল ; বাদশা চাচা মাছ নিয়ে এসেছে !

বাদশা দাড়ি নেড়ে বললে ; বিলকুল তাজা রুই। বিল থেকে নিয়ে এলাম।

শেফালির মুখে শ্যামলদার প্রশংসা আর ধরে না। কত বড়, কত মহান আমাদের শ্যামলদা। পুতুল অবাক হয়ে যায়। দেশের জন্য তার জীবন উৎসর্গীকৃত। শ্যামলের অন্তরঙ্গ ব্যবহারে শেফালির মত পুতুলের ও মনে হয় শ্যামলদা তার কত আপন।

শেফালি বলেছিল ; জানিস পুতুল, শ্যামলদা স্বদেশীগান করেন। কী সুন্দর তাঁর গলা।

সত্যি ? পুতুল খুসীতে হাততালি দিয়ে বলেছিল, কালই আমরা ওর গান শুনব। কিন্তু হারমোনিয়াম ? শেফালি বললে, হারমোনিয়াম কোথায় ? ,হারমোনিয়াম ছাড়া গান জমে না।

পুতুল একটু ভেবে বললে, নসীরামের হারমোনিয়াম চেয়ে আনব'খন। নসীরাম হাটেবাজারে সং সেজে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান গেয়ে গেয়ে সুর্য্যমাকা মাখনমলম বিক্রী করে। শ্যামলদাকে হারমোনিয়ামটা দিতে পারলে সে কৃতার্থ হবে, শেফালি একথা জানে।

সেদিন বিকেলবেলা শ্যামল শোবার ঘরে চেয়ারে বসে টেবিলে পা দুটো তুলে দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছিল। উঠানে হারমোনিয়মের ধ্বনি শুনে সে মুখ তুলে খোলা দরজায় তাকাল। পরক্ষণেই শেফালি একটা সিঙ্গলরীড্ হারমোনিয়াম নিয়ে প্রবেশ করল। তার পেছনে পুতুল।

শ্যামল স্মিতমুখে বললে, ব্যাপার কি, শেফালি ?

শেফালি টেবিলের উপর হারমোনিয়ামটা রেখে বললে, তোমার জন্য হারমোনিয়াম নিয়ে এলাম।

শ্যামল বারেক হারমোনিয়ামটার দিকে তাকিয়ে বললে, কী হবে এটা দিয়ে? আমরা গান শুনব শ্যামলদা! উত্তর দিলে পুতুল।

স্বদেশী গান। শেফালি বললে।

শ্যামল খবরের কাগজখানি টেবিলে রেখে দিয়ে বললে; হারমোনিয়াম ছাড়া বুঝি স্বদেশী গান হয় না? জান না তোমরা, হারমোনিয়াম খাঁটী বিদেশী বাদ্যযন্ত্র!

তাই নাকি! শেফালি বললে; তা'লে ওটা থাক। তুমি এমনি গাও শ্যামলদা।

শ্যামল হেসে বললে; ঐ ত মুস্কিলে ফেললে। গাইতে আমি সত্যিই জানিনে, শেফালি। ভাবছিস, সেবারত গেয়েছিলাম! কিন্তু সে প্রায় আটবছর আগেকার কথা। তখন হয়ত একটু আধটু জানতাম। কিন্তু এই আটবছরে গলা একদম বসে গেছে।

একটু থেমে বললে, গান গায় সুশী। সে গলা একবার শুনলে জীবনে ভোলা যায় না। আবার যখন সোনাপুরে আসব, সুশীকে নিয়ে আসব'খন। তোমরা তার গান শুনে মুগ্ধ হবে।

শেফালি বায়না ধরল; না শ্যামলদা তোমায় গাইতে হবে।

পুতুল বললে; তোমার গান না শুনে আমরা এখান থেকে উঠছিনে।

শ্যামল উঠে দাঁড়াল। বললে, বেশ তবে হেড়ে গলায়ই গাইছি।

বাইরে রাস্তায় ছেলেমেয়েদের কোলাহল উঠতেই শ্যামল বললে, ওরা কারা? শেফালি বললে, গাঁয়ের আর সব ছেলেমেয়ে তোমার গান শোনতে আসছে।

শ্যামল বললে; হারমোনিয়ামটা নিয়ে আসার সময় পাড়া নেমন্তন্ন করেছিস বল্। কিন্তু আমার গান শুনে সব যে পালিয়ে যাবে রে।

পরক্ষণেই দশবারোটা ছেলেমেয়ে ঘরে এসে ঢুকল। গান শুনব শ্যামলদা। কোন কথা শুনব না। সবার মুখেই আশা, আনন্দ ও উত্তেজনা।

সত্যিই, শ্যামল অনেককাল গান গায়নি। গলা তার বসে গেছে। তবু সে এদের নিরাশ করতে পারে না। হারমোনিয়ামটা টেনে নিয়ে বললে, বেশ গাইব। কিন্তু এখানে না। দল বেঁধে গান গেয়ে গ্রামের পথে পথে ঘুরে বেড়িয়ে আমরা গ্রামবাসীদের জাগিয়ে তুলব। গ্রামবাসীরা! ওঠো, জাগো। নিরাশার গাঢ় অন্ধকারে ডুবে থেকো না। দীপমালা জ্বালাও, নিশান উড়াও। মুক্তির,—স্বাধীনতায় জয়গান কর।

শ্যামল যখন কথা বলে আশ্চর্য্য এক দীপ্তি ওর চোখে মুখে ফুটে উঠে। ছেলেমেয়েরা দৃষ্টি ফেরাতে পারে না। শ্যামল বলতে লাগল, এস আমার ছোট ছোট ভাই বোনেরা, আমাদের দেশকে বন্ধনমুক্ত করবার জন্য, আমরা জীবনপণ করি। দুঃখ অত্যাচার নির্য্যাতন সবই আমরা হাসিমুখে সহ্য করব। দিগন্তে কালবৈশাখীর ঝড় ঘনিয়ে আসছে। প্রলয়ের অন্ধকারে বুঝি সব ঢেকে গেল। কিন্তু আমরা ভয় করব না। ঐ প্রলয় ঝড়ের ভেতর স্বাধীনতার দীপশিখা জ্বালিয়ে রেখে আমরা এগিয়ে চলব লক্ষ্যপথে। ঝড় যাবে কেটে। নতুন প্রভাত আসবে জাতির জীবনে।

বল মাভৈঃ বল মাভৈঃ,
বাজাও নিশান কাড়া না কাড়।
স্বাধীন নিশান তোল এবার।
শঙ্খ গরজি উঠুক সঘনে কোটীকণ্ঠের জয়ের গান।
হে সৈনিক তোল নিশান। হে সৈনিক তোল নিশান।

গান যখন শেষ হল তখন তারা সারাগ্রাম ঘুরে রথতলায় এসে পড়েছে। শ্যামল ছেলেদের নিয়ে বটগাছের ছায়ায় বসল। শ্যামলের মনে পড়ল, ব্যায়াম সমিতির বন-ভোজনের কথা। বন ভোজন ছিল, পার্টির জন্য নতুন সভ্য সংগ্রহ করার একটা উপায়। অনেকদিন পর, আজ আবার সে কাজের ডাক এসেছে।

শ্যামল ও শেফালি যখন বাড়ী ফিরল, সন্ধ্যার আর বেশী দেরী নেই। কুঞ্জদাদু গোরু ক'টাকে ঘরে তুলছিল। শ্যামলের দিকে তাকিয়ে বললে; শ্যাম, তুই না বিশ্রাম নিতে এসেছিস?

শ্যামল হেসে বললে; গান গাওয়া ত ছুটীর দিনেরই কাজ, কুঞ্জদাদু।

না, কথায় তোর সঙ্গে পেরে উঠবার জো নেই, কুঞ্জদাদু বললে, তারপর শেফালিকে বললে, তোমাকে খুঁজে খুঁজে গোরুটা একবার পুকুরঘাট, আর একবার উঠান করছে। সত্যি সত্যিই শেফালিকে দেখে গোরুটা আনন্দে লাফাতে লাফাতে ছুটে এল তার কাছে। শেফালি বললে, দিচ্ছি, এক্ষুণি তোর ফ্যান ভাত দিচ্ছি।

শ্যামল বারান্দা থেকে গোরুটাকে দেখছিল। কুঞ্জদাদু বললে; ডাকপিয়ন তোমার একটা মোড়ক দিয়ে গেছে। শোবার ঘরের টেবিলে রেখেছি।

মোড়কে করে শ্যামলের একখানি বই এসেছে। বইখানি শেফালিকে উপহার দেবার জন্য, শ্যামল লিখেছিল। সে অবশ্য জেলে যাওয়ার আগের কথা। পাণ্ডুলিপিখানি দেরাজ থেকে উদ্ধার করে উজ্জলা ছাপিয়েছিল, শ্যামল জানত না। বইখানি পেয়ে সত্যিই সে খুসী হল।

'রাজপুত্র সিদ্ধার্থের কাহিনী'। বই এর নামটা সে বারবার পড়তে লাগল। ভেতরে একখানি ছোট চিঠি ছিল, পাতা উল্টাইতেই সে দেখতে পেল:

গ্রামে আর কতদিন থাকবে? তোমার পথ চেয়ে সব আছে। পার্টিকে আবার নতুন করে সংগঠন করতে হবে, পত্রপাঠ চলে এস। ইতি উজ্জলা'।

চিঠি পড়ে শ্যামল এক মুহূর্ত্ত চুপ করে বসে রইল। সত্যিই ত, এখানে আর থাকা চলে না। চিঠিখানি জামার পকেটে রেখে বই হাতে সে বারান্দায় বেরিয়ে এল। কুঞ্জদাদু গোয়ালঘরে দরজা দিচ্ছিল। শ্যামল বললে, শেফালি কোথায়, দাদু?

পুকুরঘাটে গেছে বোধহয়। কুঞ্জদাদু বললে।

শেফালি ঘরের ভেতর বসে লণ্ঠন জ্বালাচ্ছিল। বললে, এই যে আমি শ্যামলদা। শ্যামল বইখানি শেফালিকে দিয়ে বললে, এই নাও তোমার বই, কলকাতা থেকে এসেছে। বইখানি হাতে নিয়ে শেফালি খুসীর স্বরে বললে, কি বই শ্যামলদা? শ্যামল বললে, রাজপুত্র সিদ্ধার্থের কাহিনী।

শেফালি লণ্ঠনের আলোয় বইখানির প্রচ্ছদপট পড়লে। উত্তেজিত স্বরে বললে, তুমি—তুমি লিখেছ শ্যামলদা?

শ্যামল স্মিতমুখে বললে, হ্যাঁ গো। আমার ছোটবোনটীর জন্ম লিখেছি। আমার জন্ম? আনন্দ ও উত্তেজনায় শেফালির নিঃশ্বাস ভারী হয়ে উঠল। সিদ্ধার্থের কাহিনী পড়েছ ত? শ্যামল প্রশ্ন করল। শেফালি মাথা নাড়ল। রাজপুত্র সিদ্ধার্থের কাহিনী কে না জানে।

শ্যামল একখানি আসনে বসে পড়ে বললে, জানিস শেফালি, যখন ছোট ছিলাম, সিদ্ধার্থ আমাকে প্রেরণা যোগাতেন। বিশ্ব-মানবের মুক্তির জন্ম যে দেশের রাজপুত্র সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে বনবাসী হয়ে তপস্তা সুরু করেছিলেন, আমরা সেই দেশেরই মানুষ। ত্রিশকোটী ভারতবাসীর মুক্তির জন্ম—পরাধীনতা ঘুচাবার জন্ম, আমরাই বা কেন সর্ব্বস্ব ত্যাগ করতে পারব না? আমরাই বা কেন বনে গিয়ে স্বাধীনতার তপস্তা করব না?

ছোট শেফালি শ্যামলের কথায় অর্থ বোঝে না। বোকার মত বললে, তুমি বনবাসী হবে শ্যামলদা?

শ্যামল বললে, অরণ্যেই ত বাস করছি শেফালি। যাদের জন্ম আমরা মরি তারা কেউ আমাদের বোঝে না। বুঝতে চেষ্টাও করে না। বরং উল্টো, হিংস্র জানোয়ারের মত স্বার্থের লোভে শত্রুপক্ষের হাতে আমাদের ধরিয়ে দেয়। কিন্তু এসব কথা তুমি ভাল বুঝতে পারবে না, শেফালি। বুঝবার বয়স তোমার হয়নি।

শ্যামল উঠল, বললে, আর দু'ঘণ্টা সময় হাতে আছে। রাত ন'টার গাড়ীতে আমি কলকাতা ফিরে যাচ্ছি, শেফালি।

যেন কিছুই বুঝতে পারেনি এমনিভাবে শেফালি শ্যামলের দিকে তাকাল। বললে, সে কি শ্যামলদা?

শ্যামল বললে; তুই ত জানিস বোন, আরো ক'দিন এখানে থাকতে পারলে আমি খুসী হতুম। কিন্তু উপায় নেই, আজই আমাকে যেতে হবে।

শেফালি বললে, কিন্তু আজ কি না গেলেই নয়?

না গেলেই নয়। শ্যামল বললে; রাগ করিসনি বোন। তুই আর কুঞ্জদাদু ছাড়া সংসারে আমার আর কে আছে বল! কিন্তু কাজের চাপে যে তোদের কাছে এসে দু'দশ দিন থাকার জোটী নেই।

শেফালি একমুহূর্ত্ত চুপ করে থেকে বললে, আবার কবে আসবে শ্যামলদা?

শ্যামল বললে, আবার যখন সময় ও সুযোগ হবে, তক্ষুণি ছুটে আসব।

সময় ও সুযোগ কথাটার অর্থ যে কী, শেফালির জানতে বাকী ছিল না। তাই সে উত্তর দিল না।

শ্যামল তার মুখের ভাব লক্ষ্য করে বললে; এবার গিয়েই চিঠি দোব। উত্তর দিতে ভুলিসনি, যেন।

শেফালি নীরবে মাথা নাড়ল।

খুঁটিতে হেলান দিয়ে শেফালি ম্লানমুখে দাঁড়িয়ে আছে। পুতুল এসে বার বার ডেকে গেছে। না, শেফালির আজ খেলতে যাওয়ার সাধ নেই। ছোট শেফালির আজ কোন কাজেই মন লাগছে না।

কুঞ্জদাদু বারান্দায় বসে অসমাপ্ত বাঁশের ঝুড়িটা বুনছিল। শেফালির ভাবান্তর লক্ষ্য করে বললে, কি গো দিদি! শ্যামলদা হঠাৎ চলে গেল বলে বুঝি মন খারাপ হয়েছে?

সহসা ঘোড়ার খুরের শব্দ কানে আসতেই কুঞ্জদাদু উঠে দাঁড়িয়ে পুকুর-ঘাটের দিকে তাকাল। ললিত দারোগা! তার পেছনে জন তিনেক পুলিশ। একজনের হাতে বন্দুক, বাকী দুজনের হাতে লাঠি। কুঞ্জদাদু উঠানে নেমে এল, লাগামটা জনৈক পুলিশের হাতে দিয়ে, ললিত দরোগা একলাফে ঘোড়া থেকে নীচে নামল।

ললিত দারোগা কুঞ্জদাদুর পরিচিত লোক। হাত তুলে নমস্কার করে বললে; নমস্কার কুঞ্জবাবু।

কুঞ্জদাদু প্রতি নমস্কার করে বললে; দারোগাবাবু যে! হঠাৎ কি মনে করে?

ললিত দারোগা কথাটার উত্তর দিল না, আশেপাশে বসবার যায়গা খুঁজতে লাগল। কুঞ্জদাদু একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললে, এই দেখুন আপনাকে বসতে বলতেও ভুলে গেছি।

বারান্দার একপাশে একখানি চেয়ার ছিল। কুঞ্জদাদু বললে, উপরে উঠে আসুন, দারোগাবাবু। দারোগা নিজের কর্দ্দমাক্ত বুটজুতোব দিকে তাকিয়ে বললে; বারান্দায় আর উঠছি নে। চেয়ারটা বরং নীচেই নামিয়ে নিচ্ছি। কুঞ্জদাদু নিজে চেয়ারাটা নীচে নামিয়ে দিল। ললিত দারোগা চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল।

তারপর; কুঞ্জদাদু বললে; হঠাৎ এদিকে যে বড়? কোন কেস্‌-টেস্‌ আছে বুঝি? ললিত দারোগা বললে, মশাই, কথায় বলে সুখে থাকতে ভুতে কিলানো। তা না হলে ভোরবেলা জলকাদা ভেঙ্গে তিনমাইল পথ কে আসে বলুন!

কুঞ্জদাদু মাথা নেড়ে বললে, সে ত বুঝতেই পারছি।

দারোগা নিঃশব্দে হাসল। তার পানের ছোপ লাগানো ঠোঁট ও দাঁতের দিকে তাকিয়ে কুঞ্জদাদুর সহসা মনে পড়ে যায়। বললে; শেফালি, দারোগাবাবুকে গোটা কয়েক পান সেজে দে'ত, দিদি!

এতক্ষণ শেফালি নীরবে দারোগাকে লক্ষ্য করছিল। ছোট শেফালির দৃষ্টিতে আর যাই থাক, বন্ধুত্বের লেশমাত্র ছিল না। কুঞ্জদাদুর কথার জের টেনে ললিত দারোগা বললে; গোটা চারেক পান সেজে দিয়ো ত খুকী! শেফালি উদাসস্বরে বললে, ঘরে পান নেই।

কুঞ্জদাদু বিস্মিতস্বরে বললে, সে কি! কাল হাট থেকে এক আনার পান এনেছি। শেফালি কুঞ্জদাদুর কথার উত্তর দিল না, তেমনি দাঁড়িয়ে রইল। ললিত দারোগা বললে, থাকলেও দেবে না কুঞ্জবাবু, থাকলেও দেবে না। একবার স্বদেশীমন্ত্র যার কানে যায়, সে কি আর কোনদিন দারোগাকে পান সেজে দিতে পারে?

কুঞ্জ বিমূঢ়স্বরে বললে, স্বদেশীমন্ত্র?

ললিত দারেগো হাসবার চেষ্টা করে বলতে লাগল; পুলিশের লোক আমরা;—আমরা হলুম গে' যাকে বলে ঘরের শত্রু বিভীষণ। তাই না খুকী?

ললিত দারোগার কথা শুনে শেফালি জ্বলে উঠল। বললে, শত্রুইত। ইংরাজ সরকারের জন্য আপনারা করতে না পারেন, এমন কোন কাজই নেই। ইংরাজের জন্য, নিরপরাধ দেশের লোকের বুকে ছোরা বসাতেও আপনাদের বাধে না।

ললিত দারোগা আরক্ত মুখে কুঞ্জদাদুর দিকে তাকাল। এতটুকু মেয়ে শেফালি, সে ও তাকে মুখের উপর এমনভাবে অপমান করতে পারে, ললিত দারোগার ধারণারও অতীত। কিন্তু সত্যি বলতে কি, কুঞ্জদাদু ও দারোগার চেয়ে কিছু কম বিস্মিত হয়নি। হাজার হোক, দারোগা তাঁর বাড়ীতে অতিথি। শেফালির আচরণে লজ্জা ও ক্ষোভে ম্রিয়মাণ কুঞ্জদাদু বললে, দারোগাবাবুকে এসব কি বলছিস, শেফালি?

শেফালি কিন্তু একটু ও দমল না। দীপ্ত স্বরে বলতে লাগল, সত্যি কথাই বলছি দাদু। এদের জন্যই ত, তা না হলে ব্রিটীশ রাজত্ব কবে বানের

জলে ভেসে যেত। কটা ইংরেজ এদেশে আছে, যে, ত্রিশকোটী মানুষকে গোলাম বানিয়ে রাখতে পারে ?

এবার কুঞ্জদাদুর বুঝতে বাকী রইল না। এ ত শেফালির কথা নয়, এ যে শ্যামলের কথা। কিন্তু শ্যামলও হয়ত ললিত দারোগার মুখের উপর এ সব কথা বলতে সঙ্কোচ বোধ করত। কিন্তু শেফালি—ছোট শেফালি এ সাহস পেল কোথায় ?

দারোগা বারেক কুঞ্জদাদুর দিকে তাকিয়ে পকেট থেকে ছোট্ট একটা কৌটো বের করে খুলে, গোটা দুই পান মুখে পুরে চিবোতে লাগল। বললে, বলিনি কুঞ্জবাবু ? স্বদেশী মন্ত্র, স্বদেশী মন্ত্রের যাদু এসব। এবার বুঝতে পেরেছেন কেন আমি এখানে এসেছি ?

কুঞ্জদাদু চমকে উঠল। দারোগা যে তাদের বাড়ীতেই এসেছে, এক মুহূর্ত্ত আগে ও সে ভাবেনি। দাবোগার সংলাপের ভঙ্গী থেকে এবার সব কিছুই কুঞ্জদাদুর কাছে জলের মত পরিষ্কার হয়ে এল।

তাহলে ; কুঞ্জদাদু বললে, আমার কাছেই এসেছেন ?

ললিত দারোগা বললে, হ্যাঁ আপনার কাছেই ত। আপনিই ত বাড়ীব কর্ত্তা। কুঞ্জদাদু বিস্মিত হওয়ায় ভান করে বললে, কিন্তু ব্যাপারটা যে কি কিছুই আঁচ করতে পারছি নে, দারোগাবাবু।

ললিত দারোগা বললে, খবরটা কাল রাতেই পেলাম। মিছিল, স্বদেশী গান, সভা সমিতি, হৈ হৈ রৈ রৈ কাণ্ড। এক কথায় ব্রিটিশ রাজত্ব উড়িয়ে দেবার ষড়যন্ত্র !

বলেন কি দারোগা বাবু! কুঞ্জদাদু বললে, অত বড় ব্রিটিশ সম্রাজ্য, যেখানে নাকি সূর্য্য অস্ত যায় না, কটা পুচকে ছেলেমেয়ে দুখানা স্বদেশী গান গেয়ে তা উড়িয়ে দেবে,—আপনারা কি সত্যি তাই মনে করেন ?

ললিত দারোগা গলার স্বর নামিয়ে বললে, আমাদের মনে করা-করি আর কি ? কর্ত্তারা যা মনে করে, আমবা তাই মনে করি। ওরা যা হুকুম দ্যান,

আমরা তাই তামিল করি। যাকগে সে সব কথা। কুঞ্জবাবু আপনি বুড়ো মানুষ। আপনাকে থানায় টানাহ্যাচড়া করে আর কষ্ট দিতে চাইনে। আপনার দয়া! কুঞ্জদাদু বললে।

এক মুহূর্ত কি ভেবে দারোগা বললে, আপনাকে বলতে আর বাধা কি। কালই হেড কোয়ার্টার থেকে চিঠি পেলাম, বিপ্লবী শ্যামল বসু আপনার অতিথি হয়ে এখানে উঠেছেন। তাঁর উপর কড়া পাহারা রাখতে হবে। তিনি এখানে কি করছেন না করছেন, সব খবর চাই। রাত্তিরে আবার চৌকিদারের রিপোর্ট পেলাম, শ্যামল বসু গাঁয়ের ছেলেমেয়েদের নিয়ে রীতিমত হৈচৈ সুরু করেছেন। তাই না, এই ভোরে জল কাদা ভেঙ্গে এতখানি পথ ছুটে আসা।

কুঞ্জদাদু বললে, ও! তা এখন আপনি কি করতে চান?

ললিত দারোগা বললে, সহজ কথাটা বুঝতেই পারছেন। শ্যামলবাবুকে আমার দরকার।

শেফালি এগিয়ে এল। বললে, শ্যামলদাকে আপনি ধরে নিয়ে যেতে চান?

ললিত দারোগা বললে, খুব যে দরদ দেখছি! শ্যামলদা তোমার আপন দাদা বুঝি?

উত্তর দিল কুঞ্জদাদু। বললে, শ্যামল আমাদের আত্মীয় না হলেও আত্মীয়ের বেশী, দারোগা বাবু! শ্যামলের বাবা কৃষ্ণকান্তিকে আমি মানুষ করেছিলাম। কিন্তু সে কথা যাক। শ্যামলের নামে আপনি ওয়ারেণ্ট নিয়ে এসেছেন বুঝি?

না না সে সব কিছু না। ললিত দারোগা বললে, Arrest আমি ওকে করব না। শুধু একবারটী সঙ্গে করে থানায় নিয়ে যাব। সেখানে statement লিখিয়ে ওকে ছেড়ে দোব। অবশ্য উনি যদি আমাকে অপ্রিয় কিছু করতে বাধ্য করেন, I am helpless. কোথায় শ্যামলবাবু? গাঁয়ে বেড়াতে গেছেন বুঝি?

কুঞ্জদাদু স্মিত হেসে বললে, শ্যামল ত কাল রাতের গাড়ীতেই চলে গেছে দারোগবাবু!

ললিত দারোগা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাড়াল, উত্তেজিত স্বরে বললে, শ্যামল বসু এখানে নেই বলতে চান?

কুঞ্জদাদু বিরক্ত হয়ে বললে, এর ভেতর বলাবলির কি আছে? আপনি যদি মনে করেন আমি তাকে লুকিয়ে রেখে মিথ্যেকথা বলছি—,

ললিত দারোগা বাধা দিয়ে বললে, না না, তা কেন মনে করব। আর এখানে লুকিয়ে রাখবার যায়গাই বা কোথায়? তা এক হিসাবে, শ্যামল বসু এখান থেকে চলে গিয়ে ভাল করেছেন। মশাই, সোনাপুর আর থানা, থানা আর সোনাপুর করে, রিপোর্ট লিখে লিখে প্রাণ আমার বেরিয়ে যেত। এখন কলমের এক খোঁচায় আপদ চুকিয়ে দিয়ে, লিখে দোব, পাখী উড়ে গেছে। হা হা হা।

নিজের রসিকতায় নিজেই এক চোট হেসে নিলে ললিত দারোগা। হাসি থামলে, পকেট থেকে পানের কৌটো বের করে গোটা দুই পান মুখে পুরে বললে, তা তিনি কোথায় গেছেন জানেন?

কুঞ্জদাদু বললে, তা ত জানিনে, দারোগাবাবু।

ও জানেন না। দারোগা চিন্তিত স্বরে বললে, কলকাতায় নিশ্চয়ই?

তা হবে হয়ত। কুঞ্জদাদু বললে।

ললিত দারোগা শেফালির দিকে ফিরে বললে, শ্যামলদা আবার কবে আসছেন খুকী?

শেফালি বললে, যে কোন দিন আসতে পারেন।

ললিত দারোগা বললে, বটে? তা যা বলেছ, তোমার মত শিষ্যা পেলে না এসে কি উপায় আছে···হে হে হে।

গ্রামের চৌকিদার একপাশে দাঁড়িয়েছিল। ললিত দারোগা বললে,

শ্যামল বাবু যে মুহূর্ত্তে এ অঞ্চলে পা দেবেন, সেই মুহূর্ত্তেই থানায় খবর দেওয়া চাই। মনে রেখো এর উপর তোমার চাকরী নির্ভর করছে। ললিত দারোগার যে কথা সেই কাজ, হ্যাঁ।

তারপর কুঞ্জদাদুর দিকে ফিরে ললিত দারোগা বললে, যাবার আগে বলে যাচ্ছি কুঞ্জবাবু, এই মেয়েটীকে সাবধানে রাখবেন। মানে, I mean—you know !

পরক্ষণেই দারোগার ঘোড়ার খুরের শব্দ রাস্তায় মিলিয়ে গেল। কুঞ্জদাদু বললে, সত্যি সত্যিই শ্যামল এর ভেতর আর আসবে না কি শেফালি ? না। শেফালি মাথা নাড়ল। বললে, দারোগাকে মিছে কথা বলেছি। শ্যামলদা,—বলতে বলতে তার গলা ধরে এল, শ্যামলদা এখন আর আসবে না।

কুঞ্জ বিস্ফারিত দৃষ্টিতে বারেক শেফালির দিকে তাকাল। তারপর মাথা নেড়ে বললে, না এখানে ওর না আশাই উচিত। ললিত দারোগা যেমন ওর পেছনে লেগেছে !

ছয়

সারাদেশ জুড়ে তখন আইন অমান্য অন্দোলনের ঝড় বয়ে যাচ্ছে। তুমুল উত্তেজনার ভেতর দেশের ছাত্র ও যুব সমাজ দিন কাটাচ্ছে। ইংরাজের লাঠি, বেয়নেট, এমন কি বুলেটের মুখে শোভাযাত্রার পর শোভাযাত্রা চলেছে রাস্তা দিয়ে। লাঠির ঘায়ে, বেয়নেটের চার্জ্জে, প্রতি রোজ শত শত কর্ম্মী আহত হচ্ছে।

ইংরেজ সরকারের কাছে খাদী ও গান্ধীটুপি বিদ্রোহের যুনিফর্ম হয়ে উঠেছে।

অহিংস অন্দোলনকারীদের উপর যখন এমনিধারা অত্যাচার চলেছে, বিপ্লববাদী সমিতি গুলো দেশের তরুণ ও যুবসমাজকে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা

দেওয়ার জন্য বাংলার সর্ব্বত্র এক ব্যাপক সংগঠন করল। গান্ধীবাদী অহিংস আন্দোলনকারীদের সঙ্গে বিপ্লবপন্থী সন্ত্রাসবাদীদের কর্ম্মসূচীর কোন মিল ছিল না অবশ্য, কিন্তু তখন এদের ভেতর প্রাণের যোগাযোগ ছিল এ কথা অস্বীকার করা যায় না। যে তরুণ কিশোর ঘরসংসার, আত্মীয়বন্ধু, এমন কি রাজপথে চলবার অধিকার ছেড়ে সন্ত্রাসবাদের পথে বেরিয়ে এল, নিরস্ত্র অহিংস শোভাযাত্রীদের উপর, ইংরাজ সরকারের অমানুষিক অত্যাচার তাকে প্রেরণা জাগায়নি কি ?

বিপ্লবীদের গুপ্ত ছাপাখানাগুলো ইংরেজের আইনে নিষিদ্ধ জাতীয় সাহিত্য ছাপিয়ে সর্ব্বত্র তরুণ ও যুবকদের ভেতর বিতরণ করতে লাগল। অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত এসব বই, অহিংসআন্দোলনের উত্তপ্ত আবহাওয়ায় পরিপুষ্ট যুবসমাজের ভেতর সহজেই আগুন জ্বালিয়ে দিল। বাংলাদেশে সন্ত্রাসবাদী কার্য্যকলাপ ব্যাপকভাবে দেখা দিল।

একদিকে সন্ত্রাসবাদী গুপ্ত সমিতি গুলোর কার্য্যকলাপ, অন্যদিকে অহিংস আইন অমান্যআন্দোলন কারীদের প্রকাশ্য সমর, দুয়ের চাপে ইংরাজ সরকার ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল।

কলকাতায় ফিরে এসে শ্যামল কিছুদিন দোমনা হয়ে বসে রইল। গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলন শ্যামলকে আকৃষ্ট করল। সাহিত্যিক ও কবি সে—, সত্য ও অহিংসাই ত তার ধর্ম্ম। সে ত কাউকে হিংসা করে না, এমন কি ইংরাজকে ও নয়। আক্রোশ ত তার ইংরাজ সম্রাজ্যবাদের উপর! গুপ্ত সমরের চেয়ে প্রকাশ্য সমরই ত ভাল।

বাগবাজারের এক স্যাঁত স্যাতে গলিতে ইটের পাজর বের করা পোড়ো-বাড়ী। এখানে ছিল উজ্জলাদের দলের একটা গোপন প্রেস। বাড়ীখানা এমন হতশ্রী যে, দেখে মনে হয়, এই বুঝি মাথার উপর ঝরে পড়ল। তা ছাড়া বাড়ীটার প্রবেশ পথ ছিল একটু ঘোরালো। গলির মুখে বাড়ীটার সামনে যে দরজা ছিল, তাতে একটা জং ধরা তালা বরাবর ঝুলত। দুবাড়ী

এগিয়ে একটি বস্তির মাঝখান দিয়ে, বাড়ীটার পেছনদিকের দরজায় পৌঁছান যায়। সেই দরজা দিয়ে সবাই সন্তর্পণে যাওয়া আসা করত।

এই প্রেসটার কথা, সুশীতল, শ্যামল, রমেন, সাধন, উজ্জ্বলা ও হীরু ছাড়া দলের আর কেউ জানত না। কয়েক বাক্স টাইপ আর পায়ে চলোনো একটা ট্রেড্‌ল মেসিন। তারা নিজেরাই কম্পোজ করত, নিজেরাই ট্রেড্‌ল মেসিনে পৃষ্ঠাগুলো ছাপত। এককোণে বসে শ্যামল কপি তৈরী করত। সঙ্গে সঙ্গে কয়েক ঘণ্টার ভেতর প্রচারপত্র প্রভৃতি ছাপা হয়ে বেরিয়ে যেত। হীরু ছিল ক্লাইব ষ্ট্রীটে কোন এক সাহেব কোম্পানীর পিওন। অফিসের ফাইল ইত্যাদির ভেতর নিষিদ্ধ পুস্তিকাগুলো নিয়ে পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে ঘুরে বেড়াত। ইংরাজের আইনে ঘোরতর রাজদ্রোহমূলক এই সব পুস্তক-পুস্তিকা ইত্যাদির উৎস কোথায়, খুঁজে বের করবার জন্য পুলিশ অনেকদিন ধরেই চেষ্টা করছিল। কিন্তু 'ওয়াচার' ও 'ইনফরমার' এর অস্তিত্ব সম্বন্ধে এরা ছিল সজাগ। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ধরা পড়তেই হল।

সেদিন বিকালবেলা সুশীতল বসে বসে এসরাজ বাজাচ্ছিল। সাধন নতুন সভ্য পাঁচুকে নিয়ে এল। রমেন খাটিয়ায় বসে খবরের কাগজ পড়ছিল। বারেক মুখ তুলে পাঁচুকে দেখে, সে আবার কাগজ পড়তে লাগল। সাধন সুশীকে বললে, এরি কথা সেদিন তোমাকে বলছিলাম সুশী। পাঁচু এর নাম। ছোট থেকেই একে জানি। এর দাদা আমার সঙ্গে ইস্কুলে পড়ত। সুশী উদাস স্বরে বললে ; ও !

পাঁচু বিনীত ভঙ্গীতে বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ, কলকাতা এসেছি থেকেই সাধন দার খোঁজ করছিলাম। অবশেষে সেদিন হঠাৎ ট্রামে দেখা হয়ে গেল। সাধন উঠল। বললে, তুমি বস পাঁচু, আমি একটু কাজে বেরোচ্ছি। পাঁচু ও উঠে দাঁড়াল ; বললে, আজ আমিও আসি সাধনদা। কাল আপনাকে পাব ত?

সাধন বললে ; আমি থাকি না থাকি কিছু এসে যায় না। এরা সব ত

রয়েছেন। যখনই তোমার অবসর হবে, এখানে চলে এস। পড়াশোনা, আলাপআলোচনার এমন সুযোগ তুমি আর কোথাও পাবে না।

সেইজন্যই ত আসতে চাই, সাধনদা। পাঁচু সবিনীত স্বরে বললে।

এরপর এ বাড়ীতে পাঁচু রোজই আসতে লাগল। রমেন কিন্তু তাকে গোড়া থেকেই সন্দেহের চোখে দেখতে সুরু করল। এ সব ব্যাপারে সুশী চিরকালই ঢিলে-ঢালা। রমেনের কথা শুনে বললে, পাঁচু সাধনের বিশেষ পরিচিত, একথা ভুলে যেয়ো না।

বিকাল বেলা। শ্যামল আজ ঘর থেকে বেরোয়নি। শরীরটা ভাল ছিল না। কিন্তু মনের অবস্থা ছিল শরীরের চেয়েও খারাপ। এই কদিন সহরের রাস্তায় শোভাযাত্রীদের উপর শ্যামল যে অবর্ণনীয় অত্যাচার দেখেছে, এর পর অহিংস অন্দোলনে বিশ্বাস রাখা দায় হয়ে উঠেছে তার পক্ষে। বিপ্লবী সে, অত্যাচারীকে শাস্তি দেওয়াই তাব ধর্ম্ম, অত্যাচাবীকে প্রেম বিলানো যে কত কঠিন কাজ, একথা আগে সে জানত না। নিজের খাটিয়ায় শুয়ে শুয়ে শ্যামল এসব কথাই ভাবছিল। পাশের খাটিয়ায় বসে রমেন একখানি বই পড়ছে।

নীচে সদর দরজায় প্রবেশ করেই পাঁচু ঘুরে দাঁড়াল। হীরু ছোট ব্যাগ হাতে করে সেদিকে আসছিল। পাঁচু এ বাড়ীতে হীরুকে আরো দু'একদিন দেখছে! মাঝে মাঝে সে চিঠি নিয়ে আসে, সুশী কিম্বা শ্যামলের কাছে। কোনদিন বা হাতের ব্যাগটী এদের দিয়ে যায়। ব্যাগের ভিতরকার বই গুলো দেখবার জন্য পাঁচুর আগ্রহের অন্ত ছিল না। কিন্তু সাহস করে সে কোনদিন ব্যাগ খুলতে পারেনি। আজ নীচে হীরুকে একা পেয়ে পাঁচু অন্তরঙ্গ হয়ে উঠল। একগাল হেসে বললে, কি খবর হীরু?

হীরু বললে, শ্যামলদা উপরে আছেন?

না। পাঁচু অম্লান বদনে বললে, শ্যামলদা ত বেরিয়ে গেলেন। কোন কিছু বলবার থাকে ত তিনি ফিরে এলেই আমি তাকে বলব'খন।

হীরু বললে, তিনি যদি ফিরে আসেন ত বলবেন, উজ্জলাদি 'সশস্ত্র বিপ্লবের' আধেক কম্পোজ করে বসে আছেন। এখুনি তিনি যেন বাকী কপিটুকু দিয়ে আসেন।

পাঁচু বললে, নিশ্চয়ই বলব। কিন্তু কোথায়? মানে শ্যামলদা যদি জিজ্ঞেস করেন, ত কি বলব?

বিস্তারত্ন লেনের প্রেসে। কথাটা মুখ থেকে বেরোতে না বেরোতেই হীরু সচেতন হয়ে উঠল। এই লোকটাকে প্রেসের ঠিকানটা জানানো যে অন্যায় হয়েছে হীরুর আর কোন সন্দেহ রইল না। আর এ-ই বা কেমন ধারা লোক! কেউ ত এমন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে না!

কিন্তু ইনফরমার পাঁচু আরো একধাপ এগিয়ে গেল। বললে, নিশ্চয়ই। এমন জরুরী খবরটা আমি শ্যামলদাকে দোব না? কত নম্বর বিস্তারত্ন লেন বললে?

বিনা নম্বরেও, হীরু রুক্ষ স্বরে বললে, শ্যামলদা বাড়ী খুঁজে বের করতে পারবেন।

হারু রাস্তা থেকেই ফিরে গেল। পাঁচু চারদিকে বারেক তাকিয়ে নোট বুকে ঠিকানাটা টুকে নিল। তারপর বইখানি সার্টের পকেটে রেখে সিড়ি দিয়ে উপরে উঠতে লাগল।

এই যে পাঁচু বাবু! রমেন বললে, খবর কি?

পাঁচু স্মিত হেসে একখানি চেয়ারে বসে পড়ে বললে, কদিন ধরেই কথাটা আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করব ভাবছি, কিন্তু এখানে এলে আর মনে থাকে না।

শ্যামল মুখ তুলে বললে, কি কথা পাঁচুবাবু?

পাঁচু বললে, আমার মনে হয় কি জানেন? সশস্ত্র বিপ্লব ছাড়া ইংরাজের হাত থেকে ভারত উদ্ধারের কোন সম্ভাবনা নেই।

রমেন বললে, আমরা স্যার অহিংসবাদী। আমাদের বিশ্বাস, অহিংস সংগ্রামে পরাজিত হয়ে ইংরাজ এদেশ ছাড়তে বাধ্য হবে একদিন।

একদিন? পাঁচু ঘৃণা ভরে বললে, ততদিন সোনার ভারত মরুভূমি হয়ে উঠবে। ইংরাজ এদেশের আর কিছুই অবশিষ্ট রাখবে না। না রমেনবাবু, অত ধৈর্য্য ধরে থাকলে চলবে না। ইংরাজকে রাতারাতি এদেশ থেকে তাড়াবার বন্দোবস্ত করতে হবে। আর একমাত্র সশস্ত্র বিপ্লবের দ্বারাই তা সম্ভব।

শ্যামল ও রমেনের ভেতর দৃষ্টি বিনিময় হল।

রমেন বললে, যারা ও পথে যেয়ে ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ করে দেশের স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনতে চায়, তাদের আমরা শ্রদ্ধা করি। কিন্তু আমরা স্যার, গান্ধীজী নির্দ্দেশিত অহিংস পথের পথিক। এসব দাঙ্গা ও খুনখারাপির ব্যাপারে আমরা নেই। সশস্ত্র বিপ্লব নয়,—অহিংস বিপ্লবে আমরা আস্থাবান।

অহিংস বিপ্লব? উত্তেজনায় পাঁচু উঠে দাঁড়াল, পায়চারি করে বলতে লাগল; না স্যার, ও সব অহিংস নীতি টীতি বাংলাদেশে কখনো চলেনি, আজো চলবে না। আমাদের আদর্শ ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র। আমাদের আদর্শ স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামীজী বলে গেছেন, যদি কেউ এক চড় মারে, তার গালে দশ চড় ফিরিয়ে না দিলে পাপ করবে। ঝাঁটালাথি খেয়ে চুপটি করে ঘৃণিত জীবন যাপন করলে ইহলোকে ও নরক ভোগ, পরলোকে ও তাই।

রমেন বারেক পাঁচুর দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইল।

পাঁচু বলতে লাগল, স্বামিজীর বক্তৃতা আমার কণ্ঠস্থ দেখে খুব আশ্চর্য্য হচ্ছেন, না? স্বামিজীর কাছ থেকে প্রেরণা পেয়েইত আমি এ পথে এসেছি!

কোন্ পথের কথা বলছেন? শ্যামল প্রশ্ন করল।

পাঁচু বললে, বিপ্লবের পথ দাদা, বিপ্লবের পথ।

শ্যামল বললে, বিপ্লবের পথ বড় কঠিন, পাঁচুবাবু।

আমি সেই কঠিন পথেরই পথিক। পাঁচু সগর্ব্বে বললে, দেশের যুব-

শক্তিকে জাগাতে হলে চাই সাহিত্য ;—বিপ্লবাত্মক সাহিত্য। যে সাহিত্য, শহীদের রক্তে রাঙা পথের নির্দ্দেশ দেবে !

রমেন বিরক্ত স্বরে বললে, আমি ত আগেই বলেছি, আমরা অহিংসবাদী

পাঁচু ঘৃণা ভরে বললে, অহিংসা ! না রমেনবাবু, কাপুরুষের ধর্ম্ম আমার ধর্ম্ম নয়। দেশের কাজে মরতেই যদি হয়, মেরে মরব। মার খেয়ে, পুলিশের হাতে মার খেয়ে মবব না।

যা বলেছেন ! দরজায় উজ্জ্বলা। পাঁচু তাকে দেখে থতমত খেয়ে গেল। উজ্জ্বলা বলতে লাগল, কিন্তু পাঁচুবাবু জীবনমৃত্যুর কথা কেউ বলতে পারে না।

আমতা আমতা করে পাঁচু বললে, তা—তা—

সহসা উজ্জ্বলার স্বর বদলে গেল। বললে ; হারুর কাছ থেকে কৌশলে ঠিকানা জেনে নেবাব পরও আপনি এ ঘরে এসে ঢুকেছেন। সাহস আপনাব অপরিসীম একথা স্বীকার করতেই হবে।

পলকে পাঁচুর মুখখানি ভয়ে পাঙটে হয়ে গেল। হাতে নাতে ধরা পড়ে গেছে সে। দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার জন্ম সে ছুটে গেল, কিন্তু উজ্জ্বলা ততক্ষণ দরজা আগলে দাঁড়িয়েছে। একলাফে রমেন এগিয়ে এসে পাঁচুর ঘাড় ধরে দবজা থেকে টেনে নিল। উজ্জ্বলা ভেতর দরজা বন্ধ করে দিয়ে, ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে রিভলবার বের করে পাঁচুর বুক লক্ষ্য করে বললে, মুখ দিয়ে শব্দটা বেরিয়েছে কি সব শেষ !

বেচারা পাঁচু ! তার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, সে ঘামতে সুরু করেছে। রমেন প্রথমেই একখানি কাপড় দিয়ে তার মুখ বাঁধলে। তারপর তার হাত পা বাঁধতে লাগল। পাঁচু বাধা দিলে না। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত আসামীর মত তার চিন্তা শক্তি লোপ পেয়ে গেছে।

শ্যামল বিছানা থেকে উঠে এল। বললে, এ কি করছ তোমরা ?

উজ্জ্বলা দৃঢ় স্বরে বললে ; ও আমাদের গোপন প্রেসের খবর জেনে নিয়েছে। মরা ছাড়া আর কোন উপায় নেই, ওর।

তোমরা কি পাগল হয়ে গেলে উজ্জলা? শ্যামল 'বললে। তারপর দ্রুত নিজের হাতে পাঁচুর হাত পা ও মুখের বাধন খুলে দিল। পাঁচু তখনও বলির পাঁটার মত কাঁপছিল। ছাড়া পেয়েও সে দরজার দিকে যেতে সাহস করল না। শ্যামল তাকে হাত ধরে ঘর থেকে বাইরে বের করে দিল। শ্যামলের আচরণে উজ্জলা ও রমেন ক্রুদ্ধ হল কিন্তু তারা কিছুই বললে না।

শ্যামল বললে, তোমরা হয়ত ভাবছ অহিংসবাদীদের সঙ্গে মেলা মেশা করে আমি দুর্ব্বল হয়ে পড়েছি। তা নয় উজ্জলা, এ দুর্ব্বলতা নয়, দয়া ও নয়।

রমেন বললে, ওকে ছেড়ে দেওয়া মানেটা কি, আশা করি ভেবে দেখছ শ্যামল! কয়েক ঘণ্টার ভেতর আমাদের প্রেসটা পুলিশ seize করবে, আমাদের সবার হাতে পড়বে হাতকড়ি!

শ্যামল বললে, কিন্তু ওকে হত্যা করলেই কি প্রেসটাকে বাঁচানো যেত রমেন? সেন্টিমেন্টেল হলে চলবে না। পাঁচুর মত ডজন ডজন ইন্‌ফরমার সহরের অলিতে গলিতে। একজনকে খুন করে আমরা ওদের হাত থেকে উদ্ধার পাব না। আর; একটু থেমে শ্যামল বলতে লাগল, আর, এত জানা কথাই, এই হত্যাকাণ্ডের পর পুলিশের চোখে ধুলো দেওয়া সম্ভব হত না। উজ্জলা, একথা তুমি স্বীকার করবে নিশ্চয়, এই ইনফরমারের জীবনের দামের চেয়ে আমাদের প্রত্যেকের জীবনের দাম ঢের বেশী। জেলে গেলে জেল থেকে বেরিয়ে আসব আবার। কিন্তু—

উজ্জলা বাধা দিয়ে বললে, তুমি কি করতে চাও?

শ্যামল বললে, প্রথমে প্রেসটাকে পুলিশের হাত থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করতে হবে, উজ্জলা। কিন্তু দোহাই তোমাদের। রিভলবার নিয়ে আর এখানে থেকো না।

…রাতারাতি তারা প্রেসটাকে ওবাড়ী থেকে অন্যত্র চালান দিল। পাঁচুর রিপোর্ট পেয়ে পুলিশ সবাইকে এ্যারেস্ট করতে আসবে, তারা জানত।

কিন্তু রাতটা ভালয় ভালয় কাটল। পর দিন ভোরে উঠেই উজ্জ্বলা স্নান ও প্রসাধন পর্ব্ব সেরে একখানি লাল জর্জ্জেট শাড়ী পরে বসবার ঘরে এসে বসল। রিভলবার এবং নিষিদ্ধ পুস্তক গুলো সে, রাত্রেই বাড়ী থেকে সরিয়ে দিয়েছিল। উজ্জ্বলা সোফায় বসে পুলিশের পদধ্বনির অপেক্ষা করতে লাগল।

পুলিশ তার বিরুদ্ধে হাতে কলমে কোন প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারবে না ভেবে সে স্বস্তি বোধ করল।

কিন্তু দশটা বেজে গেল; পুলিশ এল না। উজ্জ্বলা অধৈর্য্য হয়ে উঠল। বাইরে বেরিয়ে পড়বে কি না যখন সে ভাবছিল এমন সময় ঘরে ঢুকল শ্যামল।

তুমি! উজ্জ্বলা বললে, কিন্তু তোমার এখানে আসবার ত কথা ছিল না শ্যামল?

শ্যামল বললে, না। কিন্তু ঘরে বসে বসে আর কাঁহাতক পুলিশের জন্ত অপেক্ষা করা যায়? তাই পথে বেরিয়ে পড়লাম, প্রথমে গেলাম রমেনের ঘরে। রমেনও বেরিয়ে পড়েছে। তারপর এলাম তোমার এখানে। কিন্তু পাঁচু কি শেষ পর্য্যন্ত আমাদের বিরুদ্ধে রিপোর্ট করেনি উজ্জ্বলা?

উজ্জ্বলা বিদ্রূপ করে বললে, হয়ত ওর হৃদয় পরিবর্ত্তন হল, তোমার উদার ব্যবহারে। কিন্তু শ্যামল, তুমি এখানে এসে ভাল করনি!

শ্যামল বললে, ধরবে আমাদের সবাইকে এ ঠিক জেনো। তবে ছুদিন আগে আর পিছে।

উজ্জ্বলা বললে, কিন্তু দুটো দিনও যদি বাইরে থাকা যায় তাও কম লাভের নয় শ্যামল!

শ্যামল সেকথার উত্তর না দিয়ে বললে, 'সশস্ত্র বিপ্লব' লেখাটা কাল সারারাত জেগে শেষ করেছি।

উজ্জ্বলা খুসীর স্বরে বললে, তাই বল। লেখাটা নিয়ে তুমি এখুনি ৩৭নং

চলে যাও।" বুড়ীর কাছে রেখে দিলেই হবে যথা সময়ে ওটা পেয়ে যাবে। তারপর সেটা ছাপা হয়ে যথা স্থানে চলে যাবে, বিলি ব্যবস্থার জন্য।

শ্যামল উঠে দাড়াল। বললে, তাহলে আমি বেরিয়ে পড়ি।

আবার দেখা হবে। পেছন থেকে উজ্জ্বলা বললে।

হ্যাঁ, আবার—আরো অনেকবার। শ্যামল যেতে যেতে পেছন ফিরে বললে।

মিনিট কয়েক বাদেই অনেক পুলিশ অফিসার, সার্জেন্ট ও আর্মি পুলিশ নিয়ে প্রবেশ করল।

আপনারই নাম উজ্জ্বলাদেবী? পুলিশ অফিসার প্রশ্ন করল।

হ্যাঁ, উজ্জ্বলা বললে, কি দরকার?

পুলিশ অফিসার বললে, You are under arrest,

উজ্জ্বলা উঠে দাঁড়াল। দীপ্ত স্বরে বললে, ওয়ারেন্ট দেখান, ওয়ারেন্ট ছাড়া আপনি আমাকে এ্যারেস্ট করতে পারবেন না। you can't

ওয়ারেন্ট! পুলিশ অফিসার হাসতে সুরু করল, যেন এমন মজার কথা সে আর কখনো শোনেনি। বললে, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়াতে কাউকে এ্যারেস্ট করতে ওয়ারেণ্টের আবশ্যক হয় না মাদাম।

তারপর পাশে দাঁড়ানো পুলিশের দিকে ইঙ্গিত করতেই সে হাতকড়া নিয়ে এগিয়ে এল। উজ্জ্বলা বাধা দিল না, শুধু বললে, কিন্তু মনে রাখবেন, আমার বিরুদ্ধে কোন চার্জ্জ নেই।

পুলিশ অফিসার আবার হাসতে লাগল। বললে, never mind চার্জ্জ গঠন করতে দেরী হবে না। হুঁ, এবার আপনার বাড়ী আমরা সার্চ্চ করব।

উজ্জ্বলা ক্রুদ্ধস্বরে বললে, আপনাদের যা খুসী করুন।

ফুটপাত ধরে শ্যামল চলেছে। দশপনের জন ইস্কুলের ছেলে গান্ধী টুপি পরে নিশান তুলে গান গাইতে গাইতে এগিয়ে চলেছে;—

কেষ্টা যখন দেশটা জুড়ে
আনল রে ভাই যুগান্তর,
বন্দুক চালাও কামান দাগাও
পাঠাও না হয় দ্বীপান্তর।

শ্যামল তাদের দলে ভীড়ে পড়ল। সংখ্যায় নগণ্য বলেই হয়ত পুলিশ এদের দিকে দৃষ্টিপাত করেনি। পার্কে প্রবেশ করে তারা ষ্টেচুর নীচে এসে দাঁড়াল। পার্কের মাঝখানে বেদীর উপর স্বাধীনতার আলোকবর্ত্তিকাবাহী মাতৃমূর্ত্তি; ছেলেরা জয়ধ্বনি তুলে, মহাত্মা গান্ধী কি জয়।

দুজন লাঠিধারী পুলিশ ও একজন পুলিশ অফিসার তাদের পাশে এসে দাঁড়াল। একটী ছেলে বেদীর উপর উঠে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, বল, স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত অধিকার!

সিডিশন! সিডিশন! বলে, পুলিশঅফিসার চেঁচিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশরা লাঠি তুললে। মার খেয়ে ছেলেরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। আস্তে আস্তে উঠে বসল শ্যামল! দুপুরের নির্জ্জন পার্ক। লাঠির ঘায়ে কপালটা ফুলে উঠেছে।

ঘরে ঢুকে এক মুহূর্ত্ত শ্যামল দরজায় কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। দড়ির খাটিয়াগুলো উল্টানো। মেঝের উপর স্তূপীকৃত বই ও কাপড়জামা। এক ধারে তালাভাঙ্গা ট্রাঙ্ক ও স্যুটকেশ গুলো পড়ে আছে। বৈকুণ্ঠ দরজায় শ্যামলকে দেখে মড়াকান্না সুরু করল। শ্যামল তাকে ধমক দিয়ে বললে, আমার ফাঁসী হবার আগেই তুই মড়াকান্না জুড়ে দিলি, বৈকুণ্ঠ?

বৈকুণ্ঠ কাঁদতে কাঁদতে বললে, তুমি কোথায় গেছ বলতে পারলাম না তাই আমায় বুট দিয়ে বুকে লাথি মারল।

শ্যামল বারেক ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বললে, কেন তুই ওদের মারতে পারলি নি?

সে কথার উত্তর না দিয়ে বৈকুণ্ঠ চোখের জল মুছে বললে, তোমার দুটী

পায়ে পড়ি দাদাবাবু। এখানে আর বসে থেকো না—পালিয়ে যাও। শ্যামল খাটিয়ায় শুয়ে পড়ে উদাস স্বরে বললে, পালাব কেন রে ?

....শ্যামল, সুশীতল, রমেন, সাধন—সবাই ধরা পড়ল। ইংরাজ সরকার এদের অনির্দিষ্ট কালের জন্য অন্তরীণ বন্দী করল।

সাত

সহর থেকে গ্রামে, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, আইন অমান্য অন্দোলনের ঢেউ সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ল। গ্রামে গ্রামে জাতীয় পতকা উড়তে লাগল। শান্ত, নিরীহ, গ্রামবাসীরা সহসা জেগে উঠল। থানার দারোগা উপর ওয়ালাদের নির্দ্দেশক্রমে চোর ডাকাতের পেছনে না ছুটে স্বদেশীদের ধাওয়া করল।

গ্রামে আইন অমান্য করবার সহজ পথ ছিল, মদের দোকানে পিকেটিং। দারোগারা প্রতি হাটবারে শত শত পিকেটারদের ধরে সহরে চালান দিতে লাগল। ইংরাজের আদালতে এদের দুমাস থেকে ছমাস, জেল হত। জেল থেকে বেরিয়ে এসে এরা আবার পিকেটিং করত। এবার এদের কয়েদের ম্যাদ দীর্ঘতর হত।

আইন অমান্য অন্দোলনের ঢেউ ছোট গ্রাম সোনারপুরে এসেও লেগেছিল। প্রথম যে দিন গ্রামে শোভাযাত্রা করা হল, ললিত দারোগা সেদিনই গ্রামের কংগ্রেস আফিসের সেক্রেটারী মোহিত বাবুকে ধরে নিয়ে গেল। কিন্তু গ্রামের ছেলেমেয়েরা ললিত দারোগার ভয়ে শান্ত হল না। শেফালি, পুতুল, দিনেশ, ও গ্রামের ছেলেমেয়েদের নিয়ে পরদিনই আবার শোভাযাত্রা বার করল।

ললিত দারোগা এবার অভিভাবকদের শরণাপন্ন হল। প্রথমেই গেল সে কুঞ্জদাদুর কাছে। কুঞ্জদাদু হেসেই উড়িয়ে দিল দারোগার কথা। বললে,

ছেলেমেয়েরা গাঁয়ে একটু হৈ চৈ হল্লোড় করছে, এতে আপনি কেন এত ভাবছেন, দারোগাবাবু?

ললিত দারোগা শুধু বললে, এখনো সময় আছে কুঞ্জবাবু, নাতনিকে আটকান; তা না হলে শেষকালে আক্ষেপের শেষ থাকবে না।

রমেশবাবু বারান্দায় বসে খবরের কাগজ পড়ছিল। আজকাল কাগজের অধিকাংশ খবরই আইন অমান্য আন্দোলন ও আন্দোলনকারীদের সম্বন্ধে। কোন একটা গ্রামে মদের দোকানে পিকেটিং করে অনেক মহিলা পুলিশের হাতে মার খেয়েছে, সেই ছোট্ট খবরটা কাগজের এক প্রায় অদৃশ্য কোণ থেকে খুঁজে বের করে রমেশবাবু লাল-নীল পেনসিলে দাগ কাটছিল। এমন একটা খবর ছাপল কি না হেলাফেলা করে! যেমন বুদ্ধি কাগজওয়ালাদের! ললিতদারোগাকে দেখে রমেশবাবু সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল। রমেশবাবুর পরিত্যক্ত আসনে বসে ললিত দারোগা গোটা দুই পান পকেট থেকে বের করে মুখে পুরে বললে; আজকের কাগজ? কাগজখানি সামনে টানতেই লাল পেনসিলে দাগ কাটা সংবাদটা ললিত দারোগার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে ললিত দারোগা রমেশবাবুর দিকে তাকিয়ে বললে; আপনার কাছে এসেছি, রমেশবাবু।

আমার কাছে! রমেশবাবু ইতস্তত করে বললে, কি সৌভাগ্য আমার। তারপর আমতা আমতা করে বললে; লাল-নীল পেনসিলে কাগজে দাগ কাটা আমার অনেক কালের অভ্যাস কিনা।

হুঁ। ললিত দারোগা বললে; অভ্যাসটা অনেকদিনের সন্দেহ নেই। বন্ধুলোক আপনি। আপনার কোন ক্ষতি আমি করতে চাই নে। কিন্তু আপনার মেয়ে পুতুল, স্বদেশী হুজুগে মেতে উঠলে, আপনার পেনসন বন্ধ হতে পারে রমেশবাবু।

রমেশবাবুর গলা শুকিয়ে গেল। বৃদ্ধ বয়সে ঐ ক'টাকা পেনসন তার একমাত্র ভরসা। ঢোক গিলে রমেশবাবু বললে, পুতুলের কথা বলছেন?

আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, দারোগাবাবু। পুতুলকে আমি ওদের দলে মিশতে দোব না আর।

দারোগা উঠে দাঁড়িয়ে বললে, তাই করুন রমেশবাবু। সাধ করে স্বদেশীদের ফাঁদে পা দেবেন না। আর, জানেন স্যার, ঐ শেফালি মেয়েটাই যত-নষ্টের গোড়া।

রমেশবাবু উত্তরে কি বলবে বুঝতে না পেরে মাথা নাড়তে লাগল।

একটু বাদে পুতুল ফিরে আসতেই রমেশবাবু লম্প ঝম্প সুর করল। গাঁয়ের যতসব হতচ্ছাড়া ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মিশে হৈ চৈ করে পুতুল কি শেষকালে তাকে পথে বসাবে! এই বুড়ো বয়সে না খেতে পেয়ে মারা যাবে রমেশবাবু?

আজ থেকে, রমেশবাবু বলতে লাগল, আজ থেকে আমাকে না বলে কখনো বাড়ীর বাইরে পা দেবে না আর, হ্যাঁ,—

ললিত দারোগার সতর্কবাণী তার মনে পড়ে গেল। বললে, ঐ শেফালি মেয়েটাই যত নষ্টের গোড়া। ওকে এ বাড়ীতে ঢুকতে বারণ করে দিবি।

পুতুল এতক্ষণ চুপ চাপ ছিল। এবার অবরুদ্ধস্বরে বললে, আমি কেন ওকে বারণ করব। বাড়ী তোমার, তুমি নিজেই ওকে বল।

বেশ, রমেশবাবু বললে, আমিই বলব'খন।

বিকালবেলা শেফালি পুতুলকে ডাকতে এল। রমেশবাবু বাড়ী ছিল না, হাটে গেছল। পুতুল শেফালিকে সবকথা খুলে বলে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললে। শেফালি এক মুহূর্ত্ত চুপ করে বসে রইল। চোখের জল মুছে পুতুল বললে; দারোগা বাবাকে ভয় দেখিয়ে গেছে। শেফালি বললে, দাদুর কাছেও দারোগা নালিশ করেছিল, কিন্তু দাদু আমাকে কিচ্ছু বলেননি।

পুতুল বললে; দাদু ত আর বাবার মত পেনসন পান না ভাই, দারোগার কথা উনি কেন শুনবেন?

শেফালি বললে, সত্যিই ত। পেনসন বন্ধ হলে কাকাবাবুর চলবে কেমন করে? কিছুদিন তোর বাড়ী থেকে না বেরোনাই ভাল, পুতুল।

তুইও একথা বলছিস! অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে পুতুল বললে।

শেফালি বললে, তোকে কি বলব, আমি জানিনে ভাই।

শেফালি আস্তে আস্তে উঠল। বললে, কাকাবাবু আসবার আগেই সরে পড়ি।

তা'লে কাল তোরা মদের দোকানে পিকেটিং এ যাচ্ছিস? পুতুল প্রশ্ন করল। শেফালি বললে, আর কেউ যাক্ না যাক, আমি একাই যাব।

সহসা একটা কথা মনে পড়ল পুতুলের, বললে, শ্যামলদার কোন চিঠি পেয়েছিস? শেফালি মাথা নাড়ল, না। বললে, দাদু বললে, শ্যামলদা কি আর এতদিন বাইরে আছেন!

শেফালি চলে গেলে পুতুল ম্লান মুখে বারান্দায় বসে রইল। শেফালি পিকেটিং এ যাবে কিন্তু তার যাবার অধিকার নেই!

হাটে যাবার পথে বড় রাস্তার ধারে মদের দোকান। সেদিন হাটবার। সাধারণত হাটবারেই মদের দোকনে ভীড়টা একটু বেশী হয়। হাটে সওদা করতে এসে মদ্যপায়ীরা মদের দোকানে সর্ব্বস্ব দিয়ে, মাতাল হয়ে খালি হাতে বাড়ী ফিরে যায়।

মদের দোকানে পিকেটিং করা হবে খবরটা আগেই থানায় পৌঁছেছিল। ডজন খানেক লাঠি ও বন্দুকধারী পুলিশ নিয়ে ললিত দারোগা হাট সুরু হওয়ার আগেই এসে উপস্থিত। দুজন পুলিশকে দোকানের সামনে দাঁড় করিয়ে রেখে বাকী সবাইকে খানিকটা তফাতে বসিয়ে রাখল। তারপর নিজে রাস্তার ধারে বটগাছের ছায়ায় একখানি ডেকচেয়ারে বসে পান চিবোতে লাগল।

নিশান হাতে করে দীনেশ, নন্তু ও শেফালি বন্দেমাতরম ধ্বনি তুলে

মদের দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল। পুলিশ বাহিনীর দিকে তারা ভ্রূক্ষেপ ও করল না। যে দুজন পুলিশ দোকানের দরজায় দাঁড়িয়ে লাঠি হাতে পাহারা দিচ্ছিল, কৌতুকভরা দৃষ্টিতে তারা শেফালিদের দেখতে লাগল। এদিকে মজা দেখবার জন্য বড় রাস্তায় ভীড় জমে গেল। গোলমালের আশঙ্কায় নিরীহ মাতালেরা দোকানের দিকে এগোতে সাহস করল না। হলই বা তারা মাতাল, তা বলে এই সব দুধের ছেলেমেয়ে পুলিশের হাতে মার খায়, তাই কি তারা চায়?

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যাচ্ছে, অথচ একজন ক্রেতা ও দোকানে আসছে না দেখে দোকানী ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল। সহসা তার চোখে পড়ল, ভীড়ের ভেতর প্রিয় খুড়ো উঁকি ঝুকি দিচ্ছে। এ অঞ্চলে প্রিয়তোষ খব প্রসিদ্ধ মাতাল। প্রিয় খুড়ো, প্রিয় খুড়ো!—দোকানী হাত তুলে ডাকতে লাগল।

আমাকে ডাকছ মধুদাদা? ভীড়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে প্রিয় বললে।

দোকানী বললে, ওখানে উঁকি ঝুকি মারছ কেন ভাই! সটান ভেতরে চলে এস। দুটো গল্পগুজব করি।

প্রিয়খুড়ো বারেক ইতস্তত করে দু'পা এগিয়ে এল। শেফালি পাশেই বসেছিল, উঠে এসে প্রিয়খুড়োর পথ আগলে বললে, দোহাই আপনার এখানে আসবেন না।

প্রিয়খুড়ো যেন কিছুই জানে না, এমনি মুখভঙ্গী করে বললে, আসব না মানে? মধু আমার কতকালের বন্ধু। তার সঙ্গে দুটো সুখদুঃখের কথা ও কইতে পারব না? বেশ ত তোমরা!

দীনেশ পেছনে দাঁড়িয়েছিল। বললে, বুকে হাত দিয়ে বলুন ত, কেন আপনি এখানে আসতে চান?

প্রিয় খুড়ো কি উত্তর দেবে সহসা ভেবে পায় না।

শেফালি বললে, ইংরেজ ভারতবাসীর সর্ব্বনাশের জন্য হাটে হাটে

মদ গাঁজা ও আফিমের দোকান খুলেছে। জেনে শুনে আপনি কেন ইংরাজের ফাঁদে পা দিচ্ছেন ?

ফাঁদ ? প্রিয় বললে, কিসের ফাঁদ ?

শেফালি বললে, ফাঁদ বৈ কি ? মাদক দ্রব্য বর্জ্জন করুন। মদ খেয়ে নিজের সর্ব্বনাশ ডেকে আনবেন না।

মদ ! প্রিয় খুড়ো আকাশ থেকে পড়ল, রামো ! আমার চৌদ্দ-পুরুষ কখনো ও-বস্তু স্পর্শ করেনি। পরম বৈষ্ণব আমরা।

নন্তু বললে, তা'লে কেন এদিকে আসছেন ?

প্রিয় বললে ; কেন আসছি তাও তোদের বলে দিতে হবে ?

দোকানী চেঁচিয়ে উঠল, তোমার কি হে ছোকরা ?

এবার লাঠিধারী একজন পুলিশ এগিয়ে এল। পুলিশের গোঁফের দিকে তাকিয়ে প্রিয়খুড়ো পিছিয়ে গেল।

ও মশাই, পুলিশ বললে, ঐ পুঁচকে ছোড়াছুঁড়িদের ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছেন ? ভেতরে যাবেন ত যান। আমরা আছি কি করতে ?

দ্বিতীয় পুলিশ বললে ; বাপের পয়সায় মদ খাচ্ছেন। অত পরোয়া করেন কেন ? স্বদেশী হয়েছে না মাথা কিনেছে।

ব্যাপার স্থবিধের নয় বুঝতে পেরে প্রিয়খুড়ো এক পা দু'পা করে ভীড়ের ভেতর অদৃশ্য হল। প্রথম পুলিশ শেফালিকে বললে ; এই, তোমরা এখান থেকে সরে দাঁড়াও।

শেফালি পুলিশের কথায় ভ্রুক্ষেপই করল না। পুলিশ মুখ বিকৃত করে বললে ; ছুঁড়ির ইয়ে ত্মাখো।

ললিত দারোগা ডেকচেয়ার থেকে সব লক্ষ্য করছিল। এবার সে দোকানের সামনে এগিয়ে এল। প্রথম পুলিশ বললে, এ্যারেস্ট করব স্যার ?

দারোগা উত্তর দেবার আগেই প্যান্টকোট পরনে একজন লোক ক্রুতপায়ে

দোকানের দরজায় দিকে যেতে লাগল। শেফালি তার পথ আগলে দাঁড়াল। মুখ থেকে সিগ্রেট নামিয়ে লোকটা শেফালির দিকে তাকিয়ে বললে, ব্যাপার কি, এঁ্যা ?

শেফালি অনুনয়ের স্বরে বললে, মিনতি করছি মদ খাবেন না, স্যার।

লোকটি হো হো করে হেসে উঠল। বললে, খুকী বলে কি, আরে! মদ খাব না! তবে খাব কি, আরে? এ পোড়াদেশে মদ ছাড়া আছে কি?

দীনেশ হাতজোড় করে বললে, আপনি শিক্ষিত ভদ্রলোক, আপনি যদি একথা বলেন ;—

লোকটা সিগ্রেটে কষে একটান দিয়ে বললে, আমি যদি এখানে মদ খেতে আসি, তাতে তোমাদের মাথাব্যথা কেন?

ললিত দারোগা পাশে দাঁড়িয়ে নীরবে মুচকে হাসতে লাগল।

লোকটা বারেক কাঁধ ঝাকুনি দিয়ে বলতে লাগল, মদ আর আফিমের দোকান খুলে দিয়ে ইংরেজ সরকার এমন সুবিধে করে দিয়েছে, তবু নেশাভাঙ করব না, আরে?

নন্তু এগিয়ে এল। বললে, আপনার পায়ে পড়ি, স্যার!

এবার ললিত দারোগার ধৈর্য্যচুতি ঘটল। ধমক দিয়ে বললে, এই ছোকরা! আর একবার কথা বলবি ত মাথা ভেঙ্গে দোব।

লোকটা এবার দারোগার দিকে ফিরে তাকাল। এতক্ষণে সে যেন দারোগাকে দেখতে পেল। বললে, বাবা লাল পাগড়ি দেখছি যে, আরে! তা বাবা তোমরা এখানে কি করছ?

গোলমাল আশঙ্কা করে রাস্তা থেকে দু'তিন জন পুলিশ লাঠি নিয়ে এগিয়ে এল।

দারোগা রেগে বললে, সাবধানে কথা বলবেন, মশাই!

লোকটা ও রেগে গেল। বললে, এঁ্যা সাবধানে কথা বলব! জান তুমি কার সঙ্গে কথা বলছ?

লোকটার কথা শুনে দারোগা একটু চঞ্চল হল। সত্যিইত, কে জানে, লোকটা কে! লোকটা কিন্তু, ললিত দারোগার ভাবান্তর লক্ষ্য না করেই বলতে লাগল, ভয় দেখাতে এসেছ আমাকে, আরে! জেনে রেখো, দশটা সাহেব সুবো আমার ইয়ার বন্ধু! ডিপুটী কমিশনার আর পুলিশ সুপারের সঙ্গে এক টেবিলে বসে আমি মদ খাই, হ্যাঁ।

বলতে বলতে লোকটা দোকানের দরজার দিকে ফিরতেই, শেফালি তার পথরোধ করে মাটীতে শুয়ে পড়ল। বললে, যেতে হয় আমাকে পা দিয়ে মাড়িয়ে যান।

লোকটা থথমত খেয়ে গেল। কিন্তু ললিত দারোগা আর অপেক্ষা করল না, প্রথম পুলিশকে ইঙ্গিত করতেই, সে শেফালিকে টেনে হিঁচড়ে রাস্তা থেকে সরিয়ে নিল। দারোগা বললে, পিকেটিং করা বের করছি। চল থানায়।

শেফালি অম্লান বদনে বললে, চলুন!

দাঁতে দাঁতে ঘষে দারোগা বললে, চাবকে পিঠের চামড়া যখন তোলব, স্বদেশী করার মজা টের পাবে তখন।

শেফালি পিকেটিং এ আসবার সময় কুঞ্জদাদুকে বলে আসেনি। খবর পেয়ে কুঞ্জদাদু হন্তদন্ত হয়ে বাজারে ছুটে এল। ভীড় ঠেলে কুঞ্জদাদু যখন মদের দোকানের সামনে এসেছে, পুলিশ শেফালির হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিয়েছে। কুঞ্জদাদু চোখের জল সামলাতে পারল না, অবরুদ্ধ স্বরে বললে, একি করলি দিদি!

শেফালির ও চোখে জল! কিন্তু সে কাঁদল না। চোখের জল সামলে দৃঢ়স্বরে বললে, কেন তুমি ওকথা ভাবছ দাদু! জেলে যাব, তার চেয়ে খুসীর কথা আর কি আছে?

দারোগা বললে, বলিনি কুঞ্জবাবু। স্বদেশীমন্ত্র, মশাই স্বদেশীমন্ত্র।

কুঞ্জ শেফালির দিকে তাকিয়ে বললে, এখন কতদিন জেলে আটকে

রাখবে কে জানে। উত্তর দিল দারোগা। কুঞ্জদাদুকে ভয় দেখানোর জন্ত বললে, তিন বছর ত বটেই!

তিন বছর! কুঞ্জদাদু ভেঙ্গে পড়ল।

ললিত দারোগা বললে, আপনি বন্ধুলোক কুঞ্জবাবু। আপনার নাতনিকে আমি-ই কি আর এ্যারেষ্ট করতে চাই?

কুঞ্জদাদু কিছু বুঝতে না পেরে বললে, মানে?

ললিত দারোগা গলায় স্বর নামিয়ে বললে, আপনি ত জানেন স্বদেশীদের ব্যাপারে আমার হাত-পা বাঁধা। তবু আপনার জন্য আমি যথাসাধ্য করব।

কুঞ্জদাদু খুসী হয়ে বললে, সত্যি দারোগাবাবু, আপনার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার সীমা থাকবে না।

কৃতজ্ঞতার আর কি আছে এতে। ললিত দারোগা বললে, শুনুন তবে। আপনাকে বণ্ড দিতে হবে, আপনার নাতনি আর কোন দিন স্বদেশী দলে মিশবে না; তা'লে আমি একে এক্ষুনি ছেড়ে দিতে পারি।

বণ্ড? কুঞ্জদাদু ইতস্তত করে বললে!

শেফালি ফেটে পড়ল; বণ্ডে তুমি যদি সই কর দাদু, ত আমার মরা মুখ দেখবে! শেফালি এত বড় একটা প্রতিজ্ঞা করে বসতে পারে, কুঞ্জদাদুর ধারনার ও অতীত! চমকে উঠল কুঞ্জদাদু।

শেফালি বলতে লাগল; যতদিন হাটে মদের দোকান থাকবে, আমি পিকেটিং করব। দারোগা রেগে বললে; শুনলেন—আপনার নাতনির কথা, শুনলেন কুঞ্জবাবু। বেশ, তবে জেলেই পচে মর।

—শেফালিকে ধরে নিয়ে যেতে পারেন, কিন্তু আমরা আছি। দারোগা পেছন ফিরে তাকাল। গান্ধী টুপি মাথায় পরে পুতুল দাঁড়িয়ে আছে। কই, এ মেয়েটি ত এতক্ষণ এখানে ছিল না! পুতুলকে দেখে শেফালি খুসীর স্বরে বললে, তুই এসেছিস, পুতুল!

দারোগা পুতুলের হাত ধরে বললে, ভাবছ কি এখানে পিকেটিং করবার জন্ম তোমাকে রেখে যাব? উঁহু। ললিত দারোগা অত কাঁচা ছেলে নয়।

দারোগার আদেশে পুলিশ পুতুলকেও হাতকড়া পরালে।

এদের থানায় নিয়ে গিয়ে হাজত ঘরে বন্ধ কর। দারোগা প্রথম ও দ্বিতীয় পুলিশকে আদেশ করল। তারপর বাকী পুলিশের দিকে তাকিয়ে বললে, পিকেটারদের উপর বেপরোয়া লাঠি চালাবে—আমার অর্ডার। ছোট ছেলেমেয়ে বলে দয়া মায়া করা চলবে না। মনে রেখো এর উপর তোমাদের ভবিষ্যত নির্ভর করছে।

বাজার থেকে রাস্তায় উঠে দারোগা এক লাফে ঘোড়ায় চাপল।

প্যান্টকোট পরা লোকটা এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে সব দেখছিল। দোকানের সামনা থেকেই সে ফিরে গেল এবার।

মদের দোকানে পিকেটিং এর অপরাধে শেফালি ও পুতুলের একুশদিন জেল হল। সদর জেলে আরো অনেক আইন অমান্যকারী সত্যাগ্রহীদের সঙ্গে শেফালি ও পুতুলকে রাখলে। অনুমতি নিয়ে কুঞ্জদাদু একদিন শেফালির সঙ্গে দেখা করতে গেল। গার্ড শেফালিকে নিয়ে এল। মা মরা মেয়ে শেফালি; কুঞ্জদাদুর চোখে জল। শেফালি এগিয়ে এসে দাদুর পায়ের ধুলো মাথায় নিল।

কেমন আছিস দিদি? কুঞ্জদাদু বললে অবশেষে।

ভালই আছি দাদু! শেফালি বললে।

কুঞ্জদাদু বললে, ভাল আছিস! হুঁ, ওরে, আমার চোখে ধুলো দিতে পারবিনি। এই ক'দিনেই শুকিয়ে আধখানা হয়ে গেছিস।

শুকিয়ে গেছি, না দাদু? শেফালি বললে, কিন্তু সত্যি বলছি দাদু আমার কোন কষ্ট নেই। আমার মত আরো কত মেয়ে স্বদেশী করে জেলে এসেছে। গৌরী, মীনা, কানু রুনু, আমরা সব দল বেঁধে এক ঘরে থাকি।

তাই নাকি? কুঞ্জদাদু বললে।

শেফালি বললে, জান দাদু এর ভেতর দুদিন আমরা hunger strike করেছি। কথাটা বুঝতে না পেরে কুঞ্জদাদু বললে, কি করেছিস?

শেফালি বললে, উপোস। পচা খাবার দিয়েছিল কিনা, তাই?

কুঞ্জদাদু চোখ বড় করে বললে, রাগ করে উপোস করলি?

তুমি কিচ্ছু জান না দাদু। শেফালি বললে, সবার সঙ্গে উপোস করতে খুউব মজা।

সহসা কুঞ্জদাদুর মনে পড়ল। বললে, হ্যাঁ রে পুতুল কোথায়, সে এল না যে?

শেফালি বললে, কাল থেকে পুতুলের জ্বর। সে হাঁসপাতালে গেছে, দাদু।

গার্ড এগিয়ে এল। বললে, সময় হয়েছে। অন্দর চল, কুকি।

শেফালি ধমক দেওয়ার সুরে বললে, যাচ্ছি ত!

আরো দশদিন! কুঞ্জদাদু নিঃশ্বাস ছেড়ে বললে।

শেফালি হেসে বললে, তুমি বুঝি ভেবেছ দাদু, জেল থেকে বেরিয়ে আমি আর কখনো পিকেটিং করব না?

কুঞ্জদাদু হেসে বললে, তোর যা প্রাণ চায় তাই করিস, দিদি। আগে ত ঘরের মেয়ে ঘরে ফিরে আয়।

আট

গ্রামে নিজের বাড়ীতে অন্তরীণ বন্দী উজ্জ্বলা। কলকাতায় যাবার উপায় নেই। এমন কি গ্রামের বাইরে কোথাও যেতে হলে পুলিশের কাছে আবেদন নিবেদন করতে হয়। খবরের কাগজ আর বই এর ভেতর উজ্জ্বলা ডুবে থাকবার চেষ্টা করে। কিন্তু পড়ায় তার মন বসে না। খবরের কাগজ হাতে চুপটি করে বসে, আকাশপাতাল কত কি ভাবে সে। এই যে

সন্ত্রাসবাদ আন্দোলন, ও অহিংস আইনঅমান্য আন্দোলন, স্বাধীনতার সাধনায় এই দু'মুখী ধারা কোথায় এসে মিলতে হবে? অহিংসা না সন্ত্রাসবাদ, কোন পথ আমাদের কাম্য?

শ্যামলের কথা মনে পড়ে। বিপ্লবী শ্যামল অহিংস আন্দোলনে আকৃষ্ট হল। পাহাড়পুর অন্তরীণ শিবিরে বন্দী শ্যামলকে উজ্জ্বলা দুখানি চিঠি দিয়েছে। কিন্তু একখানা চিঠির জবাবও আসেনি। বিপ্লবীদের চিঠি সাধারণত পোষ্টাপিসে খুলে দেখা হয়। কে জানে, শ্যামল হয়ত চিঠিগুলো পায়নি।

উজ্জ্বলার পুলিশ-মামা একদিন গাঁয়ে এলো উজ্জ্বলার খোঁজ খবর নিতে। সম্ভবত আরো একটা গোপন উদ্দেশ্য ছিল তার।

তোর চেহারা খুব খারাপ হয়ে গেছে। পুলিশ-মামা সহানুভূতিভরা গলায় বললে।

উজ্জ্বলা বললে, বাজে কথা রাখো মামা। সত্যি করে বল দিকি এখানে কেন এসেছ?

পুলিশ-মামা বললে, তোর কি মনে হয়, আমি ডিউটিতে এসেছি?

অসম্ভব কিছুই নয়। উজ্জ্বলা হেসে বললে।

পুলিশ-মামা বললে, ডিউটিতে আমি আসিনি একথা ঠিক। কিন্তু তুই যদি আমার সাহায্য চাস—

উজ্জ্বলা হো হো করে হেসে উঠল। বললে, বণ্ডে সই করে মুক্তি পাব সেই কথা বলছ ত? সত্যি মামা, বুদ্ধিশুদ্ধি কোন কালে তোমার হবে না। কিন্তু ইচ্ছে করলে তুমি আমার একটু উপকার করতে পার, একথা স্বীকার করছি।

পুলিশ-মামা প্রশ্ন বোধক দৃষ্টিতে উজ্জ্বলার দিকে তাকাল। উজ্জ্বলা বললে, পাহাড়পুরে আমাকে পাঠাবার বন্দোবস্ত করতে পার? ওখানে পিসিমার বাড়ীতে থাকলে শরীর আমার দুদিনেই সেরে উঠবে।

পুলিশ-মামা বললে, ওখানে তোদের দলের শ্যামল ও সুশীতল অন্তরীণ আছে না?

উজ্জলা বললে, হ্যাঁ। সেজন্যই ত ওখানে যেতে চাইছি। শ্যামলকে আমার ভয়ানক দরকার মামা।

পুলিশমামা শ্যামল ও উজ্জলার বন্ধুত্বের কথা জানত। এক মুহূর্ত্ত চুপ করে থেকে বললে, চেষ্টা করে দেখব, পাহাড়পুরে তোকে পাঠাতে পারি কি না।

পাহাড়পুর গ্রামে সুশীর পৈতৃক বাড়ীতে শ্যামল ও সুশীকে আটকে রাখা হয়েছিল। গ্রামের বাইরে, বোর্ডের সড়কের পাশে এই পোড়ো বাড়ীখানাতে অনেক কালই লোকজন কেউ থাকত না।

সামনের দিকের দুখানি ঘর সুশী ও শ্যামল ব্যবহার করে। একটা শোবার ও বসবার ঘর। অন্যটা রান্নাঘর। বাকী ঘর গুলো তারা ব্যবহার করত না। পোড়োবাড়ী, কম্পাউণ্ডের ভেতর, এখানে ওখানে জঙ্গল গজিয়েছে। মাঝে মাঝে একটা সাপ কি কাঠবেড়ালি উঠানের মাঝখান দিয়ে বাড়ীর একপাশ থেকে অন্যপাশ চলে যায়। দিনদুপুরেও ইঁদুর, ঘর ও বারান্দার সর্ব্বত্র আহার্য্যের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়।

প্রায়ান্ধকার স্যাঁৎসাতে মেঝেয় মাদুরে বসে সুশী এসরাজ বজায়, গান গায়। শ্যামল বারান্দায় পায়চারি করে। যখন কিছুই ভাল লাগে না, লোক্যাল বোর্ডের সড়কে এসে সে দাঁড়ায়। দুপাশে ধানক্ষেত, মাঝখান দিয়ে সড়কটা একটা দীর্ঘ সরলরেখার মত অনেক দূর চলে গেছে। শ্যামল একমুহূর্ত্ত সেদিকে তাকায়। দুপুরের নির্জ্জন সড়ক। হয়ত বা ছাতা মাথায় কোন গ্রাম্য পথচারী এগিয়ে চলে। একটা ষাঁড় এদিক থেকে সড়কটা ডিঙ্গিয়ে মাঠের অন্যদিকে চলে যায়। ওপাশে বটগাছে কর্কশ বাগিনীতে একটা কাক 'কা' 'কা' করে ডেকে উঠে। দুপুরের রোদ মাথায় করে শ্যামল অনেকক্ষণ সড়কে দাঁড়িয়ে থাকে।

ঘরে ফিরতেই সুশী বললে ; ভুলে যেয়ো না শ্যামল—এবেলা তোমার রান্না করার কথা।

শ্যামল কাঁধ ঝাকুনি দিয়ে বললে, ঘরে ত চিঁড়েগুড় রয়েছে। এবেলা তাইতেই চলে যাবে'খন।

সরকার থেকে সুশী ও শ্যামল যে ভাতা পায়, তাতে অবশ্য খাওয়াটা কোনমতে চলে। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে, হাটবাজার নিয়ে। এ-অঞ্চলের বড় হাট, সুশী ও শ্যামলের সীমারেখার বাইরে। সপ্তাহে একদিন করে পাশেই একটা ছোট হাট বসে, অবশ্য। কিন্তু ওখানে জিনিসপত্র তেমন আমদানী হয় না। তা ছাড়া সাতদিনের মত পর্য্যাপ্ত আনাজ তরকারী কি মাছ ত আর ঘরে মজুত রাখা চলে না!

হাটবাজার করবার জন্য একজন লোক রাখতে এরা চেষ্টা করেছিল। কিন্তু স্পাই শশীভূষণ, সুশী ও শ্যামলের নামে এমন প্রচার সুরু করল যে, আজকাল গাঁয়ের লোক এ-বাড়ীর ছায়া মাড়াতেও ভয় পায়।

চিঁড়ে আর গুড়, গুড় আর চিঁড়ে। সুশী বললে, ইংরেজ সরকারের শ্রাদ্ধ আর কতকাল খাব কে জানে!

শ্যামল বললে ; যা না, তুই রান্না কর না।

সুশী বললে, কিন্তু রান্না করবার মত ঘরে কি আছে, শুনি?

কেন, চাল ত আছে। শ্যামল বললে,। আর নুন ও আছে সম্ভবত।

বেড়ালছানার মত একটা বিরাটাকার ইঁদুর ঘরের কোণে শ্যামলের চটি জুতো টানাটানি করছিল। সুশী তাড়া করতেই ইঁদুরটা চলে গেল। শ্যামল নিশ্বাস ছেড়ে বললে, জারের আমলে সাইবিরিয়া বোধহয় এর চেয়ে খারাপ ছিল না।

দূরে রাস্তায় শশী দাঁড়িয়েছিল। জানালা দিয়ে দেখতে পেয়ে সুশী বললে, সাপ, ইঁদুর চামচিকে—সবই সইতে পারি, কিন্তু টিকটিকির অত্যাচার আর সহ্য হয় না ভাই।

শ্যামল বললে, ঐ টিকটিকিরাই ত আমাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা।

যা বলেছিস। সুশী এসরাজটা কাছে নিতে নিতে বললে।

শ্যামল কাগজ পেনসিল নিয়ে তার অর্দ্ধসমাপ্ত গল্পটা শেষ করবার চেষ্টা করে। সুশী এসরাজের তারে ঝঙ্কার দিতে দিতে বলে; লেখাটা কিছু এগোল?

শ্যামল বললে, না ভাই।

জানালায় ছায়া পড়তেই সুশী ফিরে তাকাল। স্পাই শশীভূষণ দাঁড়িয়ে আছে।

জানালায় চুপি দিচ্ছেন কেন বলুন ত? সুশী বললে।

একগাল হেসে শশী বললে, আপনারা কি করছেন দেখছিলাম।

শ্যামল লেখা বন্ধ করে বললে, সামনের দোয়াব ত খোলাই আছে। সোজা ঘরের ভেতর চলে এলেই পারেন। জানালায় চুপি দেওয়ার ত কিছু দরকার নেই, শশীবাবু!

শশী বারান্দা দিয়ে ঘুরে, ঘরে এসে প্রবেশ করল। বললে ভাবলাম আপনারা হয়ত বিরক্ত হবেন। তাই—

সুশী ও শ্যামল পরস্পরের দিকে তাকাল। কিন্তু কিছুই বললে না। শশীভূষণের কথাবার্ত্তা শুনে তাকে বোকা মনে করা স্বাভাবিক। কিন্তু আসলে সে বোকা নয়।

শশী মাদুরের এককোণে বসে পড়ল, বললে, গলা স্যার আপনার। কাল যখন গাইছিলেন, সড়কে দাঁড়িয়ে আমি তন্ময় হয়ে শুনছিলাম।

শ্যামল বিদ্রূপ করে বললে, গান শুনতে আপনারও ভাল লাগে?

ভাল লাগে মানে? শশী বললে; আপনাদেব গান শুনে স্যার, পাঁজরে আগুণ ধরে যায়। শ্যামের বাঁশী শুনেও তবু ঘরে টেঁকা যায় কিন্তু আপনাদের ঐ সব স্বদেশীগান। শুনে ইচ্ছে করে সব ছেড়ে ছুড়ে বিপ্লবী দলেকে পড়ি ঢু।

সুশী বললে, দলেই ত আছেন আপনারা। ইংরাজ সরকারের গুপ্তচর বিভাগ বিপ্লবীদের সঙ্গে যেমন যোগাযোগ রেখেছে, বোধকরি সভ্যদের ও ততখানি যোগাযোগ নেই।

শশী লজ্জায় মরে গিয়ে বললে, কি যে বলেন স্যার।

তারপর শ্যামলের লেখা কাগজগুলোর দিকে তাকিয়ে বললে; আজকাল সারাদিনই আপনি লিখেন দেখছি। এত কী লেখেন, বলুন ত!

শ্যামল রূঢ়স্বরে বললে; তাও আপনাকে বলতে হবে না কি?

শশী উঠে দাঁড়াল। বললে; ঐ ত স্যার আপনি চটে যাচ্ছেন। কথাটা আপনাদের প্রতিবেশী হিসাবেই জিজ্ঞেস করছিলাম।

সুশী ফোঁড়ন দিল, বললে, ইংরাজ সরকারের গুপ্তচর হিসাবে নয়?

শশী এবার রেগে গেল। বললে, গুপ্তচর বলে আমাদের খুব ঘেন্না করেন, না? কথাটা যখন উঠলই, স্পষ্টাস্পষ্টি আমি আমার বক্তব্য আপনাদের জানিয়ে দিচ্ছি। এখানে আপনাদের এমন কিছু করতে দেওয়া হবে না, যাতে গ্রামের শান্তিভঙ্গ হতে পারে।

মানে? সুশী বললে, আপনি কি বলতে চান?

শশী বললে, ভুলে যাবেন না যে, আপনারা অন্তরীণ বন্দী। অন্তরীণ বন্দীর স্বদেশীগান করা নিষিদ্ধ।

শ্যামল বললে, সার্কুলারটা সঙ্গে এনেছেন?

সার্কুলার! শশী দর্পভরে বললে; আমার মুখের কথাই সার্কুলার।

সুশী বললে, তা'লে আমরা কি গান গাইব না গাইব, আপনাকে দিয়ে আগে pass করিয়ে নিতে হবে? ব্র্যাভো।

শশী বললে, আপনারা যা ভাল বোঝেন।

I see. শ্যামল ফেটে পড়ল; তার জন্যই পাঁজরে আগুন ধরেছিল আপনার। কিন্তু শশীবাবু, গ্রামের চাষাভূষোর পাঁজর নেহাতই ঠাণ্ডা। আপনাদের সঙ্গে ত আর তাদের তুলনা হয় না? কি করেই বা হবে?

তারা ত আর ইংরাজ সরকারের ভাতা খেয়ে দেশের মানুষের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি করে ঘুরে বেড়ায় না।

শশী রেগে বললে, আপনার কথাগুলো মনে থাকবে। তারপর দ্রুত রাস্তায় নামল সে।

সুশী পেছন থেকে বললে, আবার এস। তোমাকে একবেলা না দেখলে প্রাণ আমার আকুলি বিকুলি করে, ডার্লিং।

শ্যামল ঘরময় পায়চারি করতে লাগল। বললে, লোকটা কি চায় এখনো আমি বুঝতে পারিনি। এ ত গোয়েন্দাগিরি নয়, এযে রীতিমত টর্চার।

দরজায় তাকিয়ে সুশী চেঁচিয়ে উঠল, শ্যাম চেয়ে দেখ, কে এসেছে!

কিন্তু শ্যামলকে দেখবার অবসর না দিয়েই উজ্জ্বলা ঘরে ঢুকল।

উজ্জ্বলা! আনন্দ ও উত্তেজনায় শ্যামল বললে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল।

সুশী বার দুই চোখ রগড়ে বললে, দিবাস্বপ্ন দেখছি না ত!

উজ্জ্বলা মাদুরে বসে পড়ে বললে, আমার এখানে আসাটা কি এমনি একটা অসম্ভব ব্যাপার, সুশী?

সুশী বললে, সংসারে কিছুই অসম্ভব না। কিন্তু তুমি কেমন করে এত শীগগির মুক্তি পেলে, বলত?

উজ্জ্বলা হেসে বললে, না মুক্তি পাইনি। পুলিশ-মামার অনুগ্রহে এখানে বদলি হয়েছি।

তাই বল। শ্যামল বললে, কিন্তু এখানে তুমি থাকবে কোথায় উজ্জ্বলা?

উজ্জ্বলা খোলা দরজায় সড়কের ওপাশের লাল বাড়ীটি দেখিয়ে দিয়ে বললে, ঐ লাল বাড়ীটায়। ওটা আমার পিসিমার বাড়ী।

এলে কখন? সুশী প্রশ্ন করল।

উজ্জ্বলা বললে, এই ত এসেছি। এসেই যখন শুনলাম, তোমরা এত কাছে আছ, ছুটে না এসে পারলাম না।

দিন গুলো ভারী হয়ে উঠেছিল। কিছুতেই কাটে না। সুশী বললে, এবার তুমি এসেছ সময়টা কাটবে ভাল।

উজ্জ্বলা বললে, তোমাদের জন্য আস্ত একটি ট্রাঙ্ক ভর্ত্তি করে বই নিয়ে এসেছি। কিন্তু তোমাদের চেহারা ভয়ানক খারাপ হয়ে গেছে। এখানে খাওয়া দাওয়ার খুব অসুবিধে বোধ হয়?

শ্যামল বললে, এখানকার হাট আমাদের Jurisdiction এর বাইরে। ছোট বাজারে যদিও বা কিছু পাওয়া যায়—নিজের হাতে রান্নাবান্না করার হাঙ্গাম অনেক।

তাই না খেয়েই আছ ত? উজ্জ্বলা বললে, কথা শুনো তোমাদের পিঠ চাপড়ে দেওয়া উচিত কিনা, বুঝতে পারছিনে। নিজেরা রান্না করতে অক্ষম, দেশ স্বাধীন হলে তোমরা করবে কি বলত?

সুশী বললে, তুমি কি ভাবছ স্বাধীন ভারতে আমরা সাহেবসুবোদের বাবুর্চ্চি রাখব? উঁহু, না। ওসব বিদেশী খাবার আমার মোটেও রোচে না ভাই।

উজ্জ্বলা স্মিতহেসে বললে, তা জানি। একগ্লাস জল খাব।

জল! শ্যামল সুশীকে বললে, কুয়োটা থেকে জল তুলেছিলি আজ?

না। সুশী বললে, উজ্জ্বলাকে তুমি কুয়ো দেখিয়ে দাও না!

উজ্জ্বলা বললে, কুয়াতে যেয়ে জল খেতে হবে? থাক, জল খেয়ে আমার কাজ নেই। ঘরে এক ফোটা জল নেই, আশ্চর্য্য! এ বেলা কি তোমরা ভাত খাওনি?

শ্যামল বললে, এবার খাব।

কিন্তু, উজ্জ্বলা বললে, বিনা জলে রান্না করলে কেমন করে বল ত?

সুশী শ্যামলের দিকে তাকিয়ে বারেক ঢোঁক গিলে বললে, তা, তা জল ছাড়াও রান্না হয় বই কি। কেন, vapour এর রান্না কখনো খাওনি?

উজ্জ্বলা উঠে দাঁড়াল। বললে, তোমাদের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। রান্না-ঘরটা কোন দিকে বল ত?

শ্যামল ইতস্তত করে বললে, ঐ যে।

রান্নাঘরে ঢুকে উজ্জ্বলার বুঝতে বাকী থাকে না, উনুনে কদিন আঁচ পড়েনি। হাঁড়ী কলসীগুলো একদম খালি। এক কোণে একটি থলেতে কিছু চাল ছাড়া, ঘরে আর কিছুই নেই। শ্যামল ও সুশী উজ্জ্বলার পিছু পিছু রান্নাঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিল।

উজ্জ্বলা তাদের দিকে ফিরে তাকাতেই সুশী বললে, তা বলে ভেবো না, আমরা সত্যি সত্যিই না খেয়ে বেঁচে আছি। এই টিনটায় চিড়ে রয়েছে। ক্ষিধে পেয়ে থাকে ত তুমি ও খেতে পার।

তোমাদের চিড়ে গুড় তোমরাই খাও। উজ্জ্বলা বললে, আমি চললাম।

উজ্জ্বলা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল। শ্যামল উঠানের একপাশে কুয়োটা দেখিয়ে দিয়ে বললে, ঐ যে আমাদের কুয়ো। সত্যিই জল খাবে নাকি উজ্জ্বলা?

থাক, উজ্জ্বলা বললে, তেষ্টা আমার মরে গেছে। এ বেলা পিসিমার বাড়ী থেকে তোমাদের খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি।

You are an angel. সুশী বললে, চারটে ভাতের জন্য প্রাণ আমার আকুলি বিকুলি করছে।

উজ্জ্বলা স্মিতহেসে বললে; কিন্তু এক সর্ত্তে। যদি তোমরা কথা দাও, এরপর থেকে নিয়মিত দুবেলা রান্নাবান্না করবে।

নয়

সোনাপুর হাটের আবগারী দোকানে পিকেটিং কিন্তু বন্ধ হল না। শেফালি, পুতুল, নন্ত, দীনেশের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে প্রথমে ইস্কুলের ছেলেরা, পরে অপেক্ষাকৃত বয়স্করা আবগারীদোকানে দিনের পর দিন পিকেটিং চালাল। ললিত দারোগা প্রতিদিন দু'পাঁচজন পিকেটারদের ধরে

সহরে চালান দিতে লাগল। দিনের পর দিন. হাটের জনতা উত্তেজিত হয়ে উঠল। সেদিন ললিত দারোগা পিকেটারদের উপর লাঠি চার্জ করতেই জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে রাত্রে আবগারী দোকানে আগুন ধরিয়ে দিল। দোকানী পেছনের দরজা দিয়ে প্রাণ নিয়ে পালাল।

শেফালি ও পুতুল জেল থেকে যখন ফিরে এল, হাটে আবগারী দোকানের চিহ্নও আর নেই। শেফালি ও পুতুল চরকা কাটায় মন দিল। তাদের আদর্শে সারাগ্রামে চরকা কাটার ধুম পড়ে গেল।

জেলে রমেশবাবু দেখা করতে আসেনি, তাই পুতুলের ভয় ছিল বাবা ভয়ানক রেগে গেছেন তার উপর। কিন্তু পুতুল ফিরে এসে দেখে, রমেশবাবু আর আগের রমেশবাবু নেই। সরকার থেকে যে দিন চিঠি এল, রমেশ বাবু যদি পুতুলের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন না করে, গবর্ণমেণ্ট তার পেনসন বন্ধ করবে, রমেশবাবু চমকে উঠল। সরকার যে এ ভাবে তাকে প্ররোচিত করবে রমেশবাবু ভাবতে ও পারেনি। তার একমাত্র অপ্রাপ্তবয়স্কা মেয়ে পুতুল। সামান্ত পেনসনের লোভে রমেশবাবু মেয়েকে তাড়িয়ে দেবে, এ যারা আশা করে, তারা মানুষ নয় পশু।

রমেশবাবুর জেদ চড়ে গেল। পুতুলকে নিয়ে সে চলল লবণ আইন ভঙ্গ করতে। কদিন পরে সংবাদ এল, বাপ ও মেয়ের তিনবৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছে।

খবর শুনে শেফালি ভেঙ্গে পড়ল। দেশের কাজে পুতুল তাকে এমন ভাবে পেছনে ফেলে যাবে, শেফালি তা ভাবে নি।

সেদিন দুপুরবেলা শেফালি নিজের ঘরে বসে তকলি কাটছে। কুঞ্জদাদু তার সামনে এসে বসল; হাতে তার সন্ত আগত একখানি ডাকের চিঠি।

কার চিঠি দাদু? শেফালি বললে, শ্যামলদার না ত?

কুঞ্জদাদু মাথা নাড়ল, হ্যাঁ। একটু আগে ডাক পিয়ন দিয়ে গেল।

শ্যামলদার চিঠি? শেফালি বললে, কেমন আছেন শ্যামলদা?

কুঞ্জদাদু বললে, কেমন আছে, কৈ—কিছু ত লেখেনি। পাহাড়পুরে ওদের আটকে রেখেছে। অন্তরাল না কি যে বলে!

—পাহাড়পুর! সে কোথায় দাদু?

কুঞ্জদাদু বললে, কোথায় কে জানে? চিঠিখানি তুই নিজে পড়েই দেখ না। শেফালি বললে, শ্যামলদা আমার কথা কিছু লেখেননি দাদু?

কুঞ্জদাদু শেফালির হাতে চিঠিখানি দিল। বললে, তোর কথাই ত লিখেছে। তোর জন্ম কি শ্যামের ভাবনার শেষ আছে! শেফালি চিঠিখানি পড়তে লাগল। শ্যামল লিখেছে ;···শেফালিকে আমার আশীর্ব্বাদ জানিয়ো। আমি যেখানেই থাকি না কেন, ছোট্টবোনটীর কথা সব সময়ই আমার মনে থাকে। শোন দাদু, শেফালি জেল থেকে ফিরে এলেই সহরে কোন বোর্ডিং ইস্কুলে তাকে ভর্ত্তি করে দেবে। শেফালিকে বলো, সে যদি পড়াশোনা করতে না চায়, আমি সত্যিই দুঃখ পাব। লেখাপড়া শিখে শেফালীকে মানুষ হতে হবে—নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে।

কুঞ্জদাদু এতক্ষণ নীরবে শেফালির মুখের ভাব লক্ষ্য করছিল। শেফালি চিঠিখানি বন্ধ করতেই বললে, শ্যামল ঠিকই বলেছে। লেখাপড়া তোমাকে শিখতেই হবে, দিদি।

এক মুহূর্ত্ত কি ভেবে শেফালি বললে, আমি বোর্ডিংইস্কুলে চলে গেলে, বাড়ীতে একা থাকতে তোমার কষ্ট হবেনা, দাদু?

কুঞ্জদাদু হেসে বললে, কিন্তু জেলে যাবার আগে সে কথাটী একবার ভেবেছিলে, দিদি?

জেলে ত আর আমি ইচ্ছে করে যাইনি, শেফালি বললে। ধরে নিয়ে গেল ত, আমি কি করব, বল?

কুঞ্জদাদু মাথা নেড়ে গম্ভীরস্বরে বললে, তা ঠিক। কিন্তু আমার জন্ম তুমি কিছু ভেবো না দিদি। তুমি বোর্ডিং ইস্কুলে গেলে আমি সত্যিই খুসী হব।

শেফালী বললে, সত্যি তুমি খুসী হবে, দাদু?

মফঃস্বল সহরে মেয়েদের বোর্ডিং ইস্কুল। কড়াকড়ির শেষ নাই।

ছোট্ট দ্বিতল বাড়ী। চারপাশে উঁচু দেয়াল ঘেরা কম্পাউণ্ড। সমুখের সদর দরজা সব সময় ভেজানো থাকে। সদর দরজার বাইরে পা বাড়াতে হলে বড় মাসীমার—অর্থাৎ বোর্ডিং সুপারিন্‌টেণ্ডের অনুমতি নিতে হয়। কিন্তু বড় মাসীমার কাছ থেকে অনুমতি পাওয়া যে কত কঠিন, বোর্ডিং এসে দুমাস থাকলেই তা জানা যায়। বড়মাসীমার যেমন কাটকোট্টা চেহারা, তেমনি তার তিরিক্ষে মেজাজ। দেখে মনে হয়, যেন সব সময় রেগে আছে।

গ্রামের মেয়ে শেফালি, ছুটোছুটি দাপাদাপি করে সারা গ্রামে চরে বেড়িয়ে যার আকৈশোর কেটেছে, বোর্ডিং ইস্কুলের পাঁচিল ঘেরা এই অবরুদ্ধ পরিবেশে সে হাঁপিয়ে উঠল।

পড়ায় মন বসে না শেফালির। দোতলায় নিজের ঘরে বসে জানালা দিয়ে রাস্তায় তাকায় সে। বোর্ডিং ইস্কুলের মেয়েরা এমনিতে দুষ্টুর শিরোমণি। কিন্তু বড় মাসীমার পায়ের শব্দ শুনলে, একেবারে ভেজা বেড়ালটী। এদের মত নয় শেফালি। অহেতুক লজ্জা কিম্বা ভয়, কোনটাই তার নেই। বড়মাসীমার সামনে সে ভেজা বেড়ালের অভিনয় করতে পারে না।

ভুল বুঝলে বড় মাসীমা। তার ধারণা হল, আর সব মেয়েদের মত, শেফালী তাকে সমীহ করে না। মেয়েটীর ঔদ্ধত্য অমার্জ্জনীয়।

শেফালী! বড়মাসীমার গলা শুনে শেফালি জানালা থেকে ঘুরে দাঁড়াল। বললে, আমায় কিছু বলছেন, মাসীমা?

বড়মাসীমা খিঁচিয়ে উঠল। বললে, যখনই আমি আসি, তখনই ত দেখি জানালায় দাঁড়িয়ে আছ। পড়াশোনা কর কখন?

পড়তে ভাল লাগে না, শেফালি বললে।

বড় মাসীমা ভেংচি কাটলে; পড়তে ভাল লাগে না! মেয়ের কথার ছিরি শুন। পড়বে না ত, এখানে এসেছ কি করতে?

শেফালি বললে, বাড়ী ফিরে যেতে বলছেন?

বড় মাসীমা বললে, হ্যাঁ বাড়ী ফিরে যাওয়াই তোমার উচিত। শত শত মেয়ে মানুষ করলাম, এমন জ্যাঠামেয়ে কখনো দেখিনি।

বড়মাসীমা বেরিয়ে গেল। শেফালি জানালায় দাঁড়িয়ে রইল। নীচে রাস্তায় একদল ছেলেমেয়ের মিছিল যাচ্ছে। অন্যসময় যা হোক কিন্তু বাইরে রাস্তা দিয়ে যখন ছাত্রছাত্রীদের মিছিল যায়, শেফালি আর স্থির থাকতে পারে না। সে ও যে এদের দলের একজন! শেফালি ছুটে ঘব থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে আসে। কিন্তু সামনে বড় মাসীমাকে দেখে উৎসাহ তার নিভে যায়।

যাচ্ছ কোথায়? বড় মাসীমা বললে।

শেফালি ঢোঁক গিলে অস্পষ্ট স্বরে কি বললে, বড় মাসীমা বুঝতে পারে না। শোনো শেফালি, বড় মাসীমা বললে, বাব বার তুমি বোর্ডিং এর আইন কানুন ভেঙ্গে বাইরে বেরোচ্ছ, সহ্য আমি খুব কবেছি, কিন্তু আর করব না। স্পষ্ট জানিয়ে দিচ্ছি, এটা বোর্ডিং ইস্কুল। এখানে থাকতে হলে, বোর্ডিংএর আর সব মেয়েদের মত Discipline মেনে তোমায় চলতে হবে।

দুঃখে অপমানে শেফালির চোখে জল এল।

বড় মাসীমা বলতে লাগল, After all discipline is discipline. এটা ত আর কংগ্রেস ক্যাম্প না যে বন্দেমাতবম ধ্বনি শুনলেই রাস্তায় ছুটে যেতে হবে?

বড়মাসীমা সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে লাগল।

একদল মেয়ে এসে শেফালিকে ঘিরে দাঁড়াল।

কি হয়েছে ভাই? এই সকালবেলা বড় মাসীমা তোর উপর অমন চটে গেল কেন?

বাপস, দূর থেকে বড় মাসীমার মুখ দেখেই ভয়ে আমার বুক কেঁপে উঠে।

—তুই ও যেমন বোকা। বড়মাসীমাকে দেখলে এমন ভাবখানা দেখাবি, যেন কিচ্ছু জানিস নে।

কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে আর কাকে বলে! শেফালি চেঁচিয়ে উঠল, হয়েছে থাম। আমাকে আর উপদেশ দিতে হবে না। তোমাদের মত বড়মাসীমার ভয়ে আমি মূর্চ্ছা যাইনে।

সুধা এগিয়ে এল। বললে, আর বড়াই করিস নে। সাহস যে কার কত, আমার আর জানতে বাকী নেই।

রমা 'কমনরুম' থেকে আসছিল। বললে, জানিস সুধা, কাল যুব সম্মিলনীর মিছিল বেরোবে। ছেলেমেয়েরা মিছিলে যোগ দেবে তাই, পাবলিক একাডেমি ছুটী দিয়ে দিয়েছে। আমাদের আর মিছিলে যাওয়া হল না।

সুধা বিদ্রূপ করে বললে, তুমি মিছিলে যাবেনা শেফালি?

যাবই ত। শেফালি বললে তোমার মত ভেজা বেড়ালটা সেজে ঘরে বসে থাকব না।

উত্তরে সুধা কি বলতে যাচ্ছিল। রমা বাধা দিয়ে বললে; আচ্ছা আমরা যদি সবাই বড় মাসীমাকে বলি, বড়মাসীমা আমাদের ফিরিয়ে দেবেন?

পেছন থেকে একটি মেয়ে বললে, কোন দিন ত আমরা ওঁর কাছে কিছু চাইনি। একটী দিন ও কি বড় মাসীমা আমাদের মিছিলে যেতে দেবেন না? সুধা বললে, অত ভরসা রাখিনে। কিন্তু মিছিলে যাওয়ার জন্য ছুটী চাইতে কে যাবে ওঁর কাছে?

কেন, শেফালি বললে, আমরা সবাই যাব।

প্রস্তাবটায় কেউ সায় দিল না। বড়মাসীমার ঐ ভ্রুকুটি কুটিল দৃষ্টির সামনে, ছুটির আবেদন নিয়ে দাঁড়াবার মত উৎসাহ ও সাহস তাদের কারো

ছিল না। শেফালি তাদের মুখের ভাব লক্ষ্য করে বললে, তোমরা না যাও, তোমাদের সবার তরফ থেকে আমি একাই যাব বড় মাসীমার কাছে। কাল আমি ওঁর কাছ থেকে ছুটি আদায় করবই করব।

রমা খুসী হয়ে বললে ; বড়মাসীমার কাছ থেকে ছুটি যদি আদায় করতে পার, এ-বছরে আমরা তোমাকে ক্যাপ্টেন করব !

থ্রি চিয়ার্স ফর শেফালি। মেয়েরা খুসীর স্বরে বললে।

শেফালি এবার বড় মাসীমার কাছ থেকে ছুটি আদায় করবেই করবে। উৎসাহ ও উত্তেজনার ঝোঁকে বোর্ডিংএর মেয়েদের কেমন যেন একটা বিশ্বাস জন্মে গেল। হ্যাঁ, এতদিনে তারা সত্যিই মিছিলে যাবার অনুমতি পাবে।

পরদিন সকালবেলা স্নান করে বোর্ডিংএর মেয়েরা মিছিলে যাবার জন্য তৈরী হয়ে খাদীর সাড়ী পরে পা টিপে টিপে নীচে নেমে এল। সদর দরজা ও দালানের মাঝখানে, ব্যাটমিণ্টন খেলার একটুখানি ফাঁকা যায়গা। মেয়েরা সেখানে দাঁড়িয়ে শেফালির অপেক্ষা করতে লাগল।

শেফালি অনেকক্ষণ বড় মাসীমার ঘরে গেছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তারা অধৈর্য্য হয়ে উঠল। রাস্তা দিয়ে দলে দলে ছেলেমেয়েরা মিছিলে যোগ দিতে চলেছে।

অবশেষে শেফালি এল। তার থমথমে গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে মেয়েদের মুখ শুকিয়ে গেল।

বড়মাসীমা মিছিলে যাবার অনুমতি দিলেন না। শেফালি বললে। হোষ্টেল-কম্পাউণ্ডারের বাইরে গেলে শাস্তি দেবেন বলে ভয় দেখালেন। কিন্তু রোজ রোজ বড় মাসীমার অন্যায় আদেশ আমরা মানব না। আজকের মিছিলে আমরা যাবই।

মেয়েরা কেউ একটা কথাও বললে না উত্তরে।

এক মুহূর্ত্ত চুপ করে থেকে শেফালি বললে ; আর সময় নেই। যাবেত চল তোমরা।

সবার আগে সুধা এবং পেছনে বাকী সবাই লনে বসে পড়ল।

কারো মুখে কথাটি নেই। শেফালি রেগে বললে; তোমরা কেউ তা'লে যাবেনা?

কিন্তু শেফালি,—রমা বললে।

শেফালি ঠোঁট কামড়ে বললে, তোমরা না যাও, আমি একাই যাব।

তারপর সোজা সদর দরজার দিকে এগোতে লাগল।

শেফালি! মেয়েরা সবাই ফিরে তাকাল। পেছনের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে বড়মাসীমা। শেফালি লনের মাঝখান থেকে ফিরে তাকাল। বড়মাসীমা সিঁড়িব নীচের ধাপে নেমে এল। উত্তেজিত স্বরে বললে, তোমার অবাধ্যতা, তোমার একগুঁয়েমি—এককথায় তোমার বেয়াদবি আমায় অবাক করেছে শেফালি। কতদিন তোমায় বলেছি, এটা হোষ্টেল, স্বদেশীদের আড্ডা নয়। সভা সমিতি, তার উপর যখন খুনী হোষ্টেল থেকে বেরিয়ে যাওয়া, এখানে এসেছে অবধি গোটা হোষ্টেলটাকে ক্ষেপিয়ে তুলেছ। Enough, আমি আর সইব না। আমি তোমাকে আর একবার সাবধান করে দিচ্ছি, সদর দরজার বাইরে পা বাড়িয়ো না।

আজ শেফালি কিন্তু একটুও নার্ভাস হল না। সহজস্বরে বললে. মিছিলে যাচ্ছি বড় মাসীমা।

তারপর আস্তে আস্তে সদর দরজার দিকে যেতে লাগল।

বড়মাসীমা গলার স্বর একপরদা চড়িয়ে বললে; অবাধ্য মেয়ে! এর শাস্তি কি জান?

শেফালি যেতে যেতে ফিরে তাকিয়ে বললে, মিছিল থেকে ফিরে এসে জিজ্ঞেস করব, মাসীমা।

বড় মাসীমা এবার চেঁচাতে সুরু করল, শেফালি এখনো সময় আছে। ফিরে এস বলছি।

শেফালি আর ফিরে তাকাল না। আস্তে আস্তে সদর দরজা খুলে

রাস্তায় বেরিয়ে আসতেই বড় মাসীমার চীৎকার তার কানে এল : মনে রেখো, এ দরজা আজ থেকে চিরকালের জন্য তোমার জন্য বন্ধ হল।

শেফালি থমকে দাঁড়াল। বারেক বন্ধ দরজার দিকে সে তাকাল। কিন্তু দূরে রাস্তার মোড় থেকে জয়ধ্বনি ভেসে আসতেই, সে আর দাঁড়াল না। মিছিলের উদ্দেশ্য দ্রুত এগিয়ে চলল শেফালি।

বিকালবেলা, উঠানে বেতের মোড়ায় বসে কুঞ্জদাদু বাদশামিঞার সঙ্গে গল্প করছিল। দুজনেরই হাতে দুটো হুঁকো।

যা বলেছেন রায়মশায়। একগাল ধোঁয়া ছেড়ে বাদশা মিঞা বললে ; দিদি বাড়ী থাকলে সারাবাড়ীটা যেন হাসে। শেফালিদিদিও নেই, বাড়ীর লক্ষ্মী ও নেই। রায়মশায়, শেফালিদিদির ইস্কুল কবে ছুটী হবে? কবে তেনাকে বাড়ী নিয়ে আসবেন ?

কুঞ্জদাদু বললে, পূজোর ছুটির আগে ত আর সে আসবে না, বাদশা মিঞা।

বাদশা মিঞা বললে; পূজোর ছুটীর ত আর বেশী দেরী নেই বোধহয় ?

দেরী আছে বই কি। কুঞ্জদাদু বললে ; তারপর আঙুলে গুণতে লাগল। বললে, শেফালির বাড়ী আসতে এখনো পূরো একটা মাস বাকী !

দাদু, শেফালির গলা শুনে কুঞ্জদাদু ও বাদশা মিঞা দুজনেই চমকে উঠল। পরক্ষণেই শেফালি ছুটে এসে উঠানে প্রবেশ করল।

দিদি তুই এসেছিস। আনন্দ ও উত্তেজনায় কুঞ্জদাদু উঠে দাঁড়াল। বাদশা মিঞা আর আমি এতক্ষণ তোর কথাই বলাবলি করছিলাম।

বাদশা মিঞা একগাল ধোঁয়া ছেড়ে বললে ; মিথ্যে কি আর বলি, আজকাল রায়মশায়ের হিসাবে ভুল হয়? একমাস কবে কেটে গেছে, রায়মশায় বলছে, পূজোর ছুটীর এখনো একমাস দেরী।

হিসাবে ভুল হয়নি বাদশা মিঞা। কুঞ্জদাদু স্মিতমুখে বললে, হিসাব ঠিকই আছে। শেফালির ইস্কুল এবার তাড়াতাড়ি ছুটী হয়ে গেছে।

শেফালি কুঞ্জদাদুর পরিত্যক্ত মোড়াটায় বসে পড়ে বললে, ছুটী ত হয়নি দাদু!

ছুটী হয়নি? কুঞ্জদাদু বিস্মিতস্বরে বললে। তুই বুঝি ছুটী নিয়ে এলি? না। শেফালি বললে; বোর্ডিংইস্কুল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

শেফালির কথা শোনে একমুহূর্ত্ত কুঞ্জদাদু বিমূঢ় হয়ে গেল। বোর্ডিং ইস্কুল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে! বলে কি শেফালি?

শেফালি বললে; স্বদেশী করে নাকি আমি গোটা বোর্ডিংটাকে ক্ষেপিয়ে তুলেছি। তাই,—

তাইজন্য তাড়িয়ে দিলে? কুঞ্জদাদু বললে, অমন বোর্ডিং ইস্কুলে না থাকাই ভাল।

সহসা কুঞ্জদাদুর খেয়াল হল। বললে, কিন্তু তোর বাক্সবিছানা সব কোথায় রে?

সব হোস্টেলে ফেলে এসেছি দাদু! শেফালি বললে; মিছিলে যাচ্ছিলুম, বড় মাসীমা বললে, হোস্টেলের দরজা তোমার কাছে চিরকালের জন্য বন্ধ হল। তাই সেখান থেকে হোস্টেলে না ফিরে সোজা বাড়ী চলে এলাম।

শেফালি উঠে দাঁড়াল।

বেশ করেছিস। কুঞ্জদাদু বললে; এখন হাতমুখ ধুয়ে আয় ত দিকি। সারাদিন ত পেটে কিছু পড়েনি!

এক মুহূর্ত্ত কুঞ্জদাদুর দিকে তাকিয়ে শেফালি বললে, আমার ওপর রাগ করনি ত দাদু?

কুঞ্জদাদু তার পিঠে হাত রেখে বললে, না রে পাগলি, রাগ করব কেন?

দশ

সুশীর বাড়ী থেকে উজ্জ্বলার পিসীমার বাড়ী দু মিনিটের পথ। য়ুনিয়ন বোর্ডের সড়কের এপাশ ওপাশ। সকাল দুপুর বিকাল, যখন খুসী উজ্জ্বলা এ বাড়ীতে চলে আসে। আলাপ জমাতে সে চিরকালই ওস্তাদ। পাহাড়পুরে আসবার সময় উজ্জ্বলা সঙ্গে করে সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানের একগাদা বই নিয়ে এসেছিল। সুতরাং আলোচনা করবার বিষয়বস্তুর অভাব ছিল না। তাদের আলোচনায় কিছুই বাদ পড়ত না।

উজ্জ্বলার পিসীমার আর্থিক অবস্থা ত ভালই ছিল, উপরন্তু তাঁর ছেলেরা দিল্লীতে, সিমলাতে ইংরাজ সরকারের দপ্তরে বড় চাকরী করে। পিসীমা সাধারণত পাহাড়পুরের বাড়ীতেই থাকে।

অন্তরীণ বন্দী উজ্জ্বলার পাহাড়পুরে আসাটা পিসীমা পছন্দ করেনি। কিন্তু উজ্জ্বলা যখন শ্যামল ও সুশীর সঙ্গে ঘনিষ্টতা সুরু করল, পিসিমা রীতিমত বিরক্ত হয়ে উঠল।

একটা কথা বলব উজ্জ্বলা। সেদিন পিসীমা বললে; যা হবার তা ত হয়েই গেছে। কিন্তু এদের সঙ্গে আর ঘনিষ্টতা না করাটাই ত ভাল।

উজ্জ্বলা বললে; পিসীমা, কাল থেকে আমি অন্যত্র থাকবার বন্দোবস্ত করব।

উজ্জ্বলার আর্থিক সঙ্গতি সম্বন্ধে পিসীমা পুরোমাত্রায় সচেতন। উজ্জ্বলার বাবা যে পরিমাণ নগদটাকা ইত্যাদি রেখে গেছেন, সে পরিমাণ অর্থসংগ্রহ করতে পিসীমার ছেলেদের আরো কয়েক বছর লাগবে। বাধা দিয়ে পিসীমা বললে, তোকে কি বললাম আর তুই কি বুঝলি! আমি কি ইংরাজ সরকারের পরোয়া করি, না ছেলেদের পরোয়া করি। এ বাড়ী আমার!

এই ত জমিদারগিন্নীর মত কথা হল, উজ্জ্বলা হেসে বললে।

উজ্জ্বলা পিসীমার মুখ বন্ধ করল অবশ্য, কিন্তু পাই শশীভূষণের সন্দিগ্ধ দৃষ্টির হাত এড়াতে পারল না। সুশী ও শ্যামলের সঙ্গে উজ্জ্বলার এই ঘনিষ্ট মেলামেশা, দিনের পর দিন শশীর অসহ্য হয়ে উঠল।

উজ্জ্বলা প্রথম যেদিন পাহাড়পুরে এল, সত্যি বলতে কি, শশী আড়াল থেকে দেখে এক মুহূর্ত্ত চোখ ফেরাতে পারল না।

উজ্জ্বলার সান্নিধ্যের জন্য শশী লালায়িত হয়ে উঠল। ঘন ঘন উজ্জ্বলার বাড়ীতে যাতায়াত সুরু করল সে।

শশী জানত, শ্যামল ও সুশীতলের মত উজ্জ্বলাও তাকে ঘৃণা করবে। তবু সে নিজের দুর্ব্বলতা জয় করতে পারে না।

বিকালবেলা উজ্জ্বলা বেরোচ্ছিল। শশীকে বারান্দায় দেখে থমকে দাঁড়াল। উজ্জ্বলাকে কিছু বলবার অবসর না দিয়ে শশী হাসবার চেষ্টা করে বললে, নমস্কার উজ্জ্বলাদেবী।

উজ্জ্বলা প্রতি নমস্কার করল না। সকাল দুপুর বিকাল, শশীর নমস্কারের ঠেলায় সে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। বললে ; ব্যপার কি বলুন ত ?

শশী মাথা চুলকে বললে ; এই, এই এলাম।

সে ত দেখতেই পাচ্ছি। উজ্জ্বলা বললে ; কিন্তু কেন ?

আপনার খোঁজ খবর নিতে। শশী বললে !

উজ্জ্বলা বিরক্তস্বরে বললে ; দিনে তিনবেলা আমার খোঁজ খবর নে'বার মানেটা কি ?

শশী আহতস্বরে বললে, আমি এলে আপনি বিরক্ত হন, আমার জানা ছিল না।

উজ্জ্বলা বললে, ব্যস্। আজ থেকে জানলেন। সকাল, দুপুর বিকাল আর কাঁহাতক আপনার মুখ সহ্য করা যায়, বলুন !

শশী এবার রেগে গেল। বললে, আপনার জেনে রাখা উচিত উজ্জ্বলা দেবী, এখানে আমি ডিউটিতেই আসি !

উজ্জ্বলা সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বললে, ও তাই নাকি? স্বীকার করতেই হবে, আপনার মত ইংরেজভক্ত কর্ম্মচারী বেশী দেখিনি।

উজ্জ্বলার কাছে অপমানিত হয়ে শশী ক্ষেপে গেল। যেমন করে হোঁক এ অপমানের শোধ সে নেবেই।

উজ্জ্বলা, শ্যামল ও সুশী রোজ বিকালবেলা গল্প করতে করতে সড়ক ধরে বেশ খানিকটা ঘুরে অসত। সড়কটা যেখানে বেঁকে, গাঁয়ের ভেতর দিয়ে চলে গেছে, সেখানে ছোট্ট একটা পুল। তারা মাঝে মাঝে পুলের রেলিংএ বসত। ছদ্মবেশে শশী তাদের রোজই অনুসরণ করত। সুশী ভাল গাইতে পারে। শশীর কেমন একটা ধারণা হল, উজ্জ্বলা সুশীকেই ভালবাসে।

সেদিন শ্যামলের শরীরটা ভাল ছিল না। শ্যামল বাড়ীতে রইল, উজ্জ্বলা ও সুশী গেল বেড়াতে। শশীর ধারণা বদ্ধমূল হল, হ্যাঁ শ্যামল নয়, সুশীই। সুশীকে পাহাড়পুর থেকে সরাবার জন্য সে মিথ্যা রিপোর্ট করল।

দিনকয়েক বাদে থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার পুলিনবাবু দুজন বন্দুকধারী পুলিশ নিয়ে সুশীর ঘরে এসে হাজির। হাতঘড়ি দেখে পুলিনবাবু বললে সুশীবাবু আপনাকে এক্ষুণি আমার সঙ্গে আসতে হবে।

সুশী ও শ্যামল পরস্পরের দিকে তাকাল। বিস্মিত হওয়ার অবশ্য কিছু নেই। ইংরাজের অন্তরীণক্যাম্পে পুলিশ অফিসারেরা সর্ব্বময় কর্ত্তা। যা তাদের খুসী, তাই তারা করতে পারে।

কোথায়? শ্যামল প্রশ্ন করল।

পুলিনবাবু বললে, আপাততঃ ইষ্টিশনে। ট্রেন ছাড়বার আর বেশী দেরী নেই। I am afraid, আমি আপনাকে সময় দিতে পারব না। আপনার বাক্স টাক্স কিছু থাকলে, নিয়ে নিন।

সুশী বললে, কিন্তু হঠাৎ,—

পুলিশ বললে, অনিবার্য্য কারণে আপনাকে এখান থেকে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। এর বেশী আর কিছু বলতে পারব না। Hurry up.

স্থশী বারেক শ্যামলের দিকে তাকিয়ে উঠে দাঁড়াল। বললে, আমি তৈরী। আপনার লাগেজ? পুলিনবাবু বললে।

স্থশী বললে, লাগেজ আমার নেই। কিন্তু আপনার আপত্তি না থাকে ত এসরাজটা সঙ্গে নোব।

এসরাজ! পুলিনবাবু মেঝের উপর সঙ্গীতযন্ত্রটীর দিকে তাকিয়ে বললে, তা সঙ্গে নিতে পারেন।

তারপর রসিকতা করে বললে, এর ভেতর বোমা টোমা নেইত মশাই?

উজ্জ্বলা খেতে বসেছিল। রাস্তায় পুলিশ ভ্যান দেখতে পেয়ে খাবারের থালা সামনে ঠেলে দিয়ে, দ্রুত নীচে নেমে এল। কিন্তু ঘটনাটা এত তাড়াতাড়ি ঘটল যে, উজ্জ্বলা আসবার আগেই স্থশীকে নিয়ে পুলিশভ্যান চলে গেল।

ভ্যান থেকে স্থশী উজ্জ্বলাকে দেখতে পেয়ে রুমাল নাড়তে লাগল। কিন্তু ঘটনাটার আকস্মিকতায় উজ্জ্বলা এমন বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল যে সে রুমাল নাড়তেও ভুলে গেল।

স্থশীকে সরিয়ে নেওয়ায় শ্যামল ভেঙ্গে পড়ল। সত্যি বলতে কি স্থশী ছিল তার প্রেরণা। যখনই সে হতাশা ও অবসাদে ভেঙ্গে পড়ছে, লঘু হাস্য পরিহাসে স্থশী তাকে প্রফুল্ল করে তুলেছে।

কদিন ধরে উজ্জ্বলা শ্যামলের এই ভাব পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করেছিল। সেদিন বললে, শ্যামল তোমার সেই রাজনৈতিক উপন্যাসখানি, যে কাহিনীটা আমাদের মুখে মুখে বলেছিলে, এবার সেটা লিখতে স্থরু কর।

কিন্তু শ্যামল সাড়া দিলনা। শ্যামলকে 'মুডে' আনবার জন্য কদিন সে তার পেছনে লেগে রইল। লিখবার কাগজ ও পার্কার কলম তার সামনে এনে রাখল। বললে, তোমাকে লিখতেই হবে, শ্যাম। তুমি না লিখলে, বিপ্লবীদের কথা দেশবাসীর কাছে কে পৌছে দেবে বল।

বিপ্লবীদের কথা? শ্যামল ভাবতে লাগল। হ্যাঁ সত্যিই ত। বিপ্লবীদের কথা, তাদের আশা, আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন ও সাধনার কথা দেশের লোকেরা কতটুকু জানে। শ্যামল তাদের কথা দেশের মানুষেব কাছে পৌছে দেবে। হ্যাঁ, সে লিখবে।

সত্যি সত্যিই শ্যামল লিখতে সুরু করল। উজ্জ্বলা তার পাশে বসে স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ল।

ইউনিয়নবোর্ডের সড়কের পাশে কুলগাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে শশী পাহারা দেয়। উজ্জ্বলা দিনে ক'বার শ্যামলের ঘরে আসে, শশী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাব নোটবই-এ লিখে।

পাহাড়পুর থেকে সুশীকে সরিয়ে কি ভুলই না করেছে শশী! আগে যদি সে জানত, উজ্জ্বলা শ্যামলকে ভালবাসে! ঈর্ষ্যার আগুনে সে পুড়ে মরে। যেমন করে হোক এদের মেলামেশা বন্ধ করতে হবে।

স্পাই শশীভূষণের মাথায় ফন্দিফিকির ও মতলবের অভাব নেই। এবার সে, শ্যামলও উজ্জ্বলা—দুজনের বিরুদ্ধেই রিপোর্ট করল। অন্তরীণ ক্যাম্পে এদের মেলামেশা করতে দেওয়াটা যে রাষ্ট্রের নিরাপত্তার পক্ষে সমূহ বিপজ্জনক, শশী তার রিপোর্টে তাই লিখলে।

যথাসময়ে হেড কোয়ার্টার থেকে নির্দেশ এল। পুলিনবাবু শশীকে বললে, কেন যে আপনি এদের পেছনে লেগেছেন, তা আমার বুদ্ধির অগোচর।

শশী মাথা চুলকাতে লাগল। বললে, ওরা যে মতলব এঁটেছিল স্যার,—

বাধা দিয়ে পুলিনবাবু বললে, ওসব আমাকে আর বলবেন না। মার কাছে মামাবাড়ীর গল্প! ওদের একজনকে ত এখান থেকে সরালেন। এবার বাকী দুজনকে Practically সেলের ভেতর পুরে রাখা হবে।

কিন্তু স্যার,—শশী বললে।

চাকরী অবশ্য বজায় রাখতেই হবে জানি। পুলিনবাবু বললে, আমাকে

আপনাকে, সবাইকে। কিন্তু যতদূর সম্ভব, মিছিমিছি মানুষকে কষ্ট না দেওয়াই উচিত, শশীবাবু!

শশী মনে মনে রেগে গেল। কিন্তু বাইরে, গম্ভীর স্বরে বললে, আমি আমার কর্ত্তব্য করেছি স্যার।

বাকী কর্ত্তব্যটুকু ও শেষ করে আসুন। পুলিনবাবু বললে, এই চিঠি দুখানি ওদের Personaly দিয়ে আসুন।

শশী ঠিক তাই চেয়েছিল। সে তার নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে উজ্জ্বলা ও শ্যামলকে অবহিত করতে চায়। বিশেষ করে উজ্জ্বলাকে। সে জেনে রাখুক, ইচ্ছে করলে শশী তাকে আরো কষ্ট দিতে পারে।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে শ্যামল উজ্জ্বলার জন্য অপেক্ষা করছিল। শশীকে দেখে বললে, এই যে শশীবাবু, কদিন আপনাকে দেখিনি কেন বলুনত?

শশী মুচকে হেসে বললে, দেখলেই ত গালাগাল করবেন, স্যার। সেজন্য আর আসি না। এই নিন আপনার চিঠি।

—আমার চিঠি?

কিন্তু কাগজখানিব উপর চোখ বুলিয়ে শ্যামল এক মুহূর্ত্ত বিমূঢ় হয়ে গেল। এই আদেশের কী যে মানে, তার মাথায় ঢুকল না।

সামনে দাঁড়িয়ে শশী। চোখ ছোট করে মুচকে হাসছে।

মানে? অবশেষে শ্যামল বললে।

শশী বললে, মানে খুবই সহজ। না বুঝে থাকলে, চিঠিখানি আর একবার পড়ুন—বুঝতে পারবেন।

শ্যামল বললে, তালে এখন থেকে আমি ঘরের ভেতর বন্দী?

শশী বললে, তা কেন, তা কেন। ঠাণ্ডা মাথায় চিঠিখানি পড়লেই জানতে পাবেন, আপনার সীমানা পশ্চিমে বাজার—পূবে ইস্কুলবাড়ী, দক্ষিণে ঐ বটগাছ। আর এপাশে, শশী কথাটার উপর একটু জোর দিলে, এ-পাশে

য়ুনিয়ন বোর্ডের সড়ক। মনে রাখবেন, সড়কে উঠবার কোন অধিকার আপনার নেই।

তারপর একটু থেমে, শ্যামলের মুখের ভাব লক্ষ্য করে মুচকে হেসে বললে, তা বাউণ্ডারীটা কি কিছু কম হল, শ্যামলবাবু?

না। শ্যামল বললে, কিন্তু আস্তে আস্তে আমার চার দিকে গণ্ডীটা ছোট করে দেওয়ার মানে কি, বলুন ত?

কী জানি মশায়। শশী উদাসস্বরে বললে।

শ্যামল বললে, আমাকে খাঁচায় পুরে কী লাভটা হল আপনার, শশীবাবু?

শশী বললে, ঐ ত মিছি মিছি আমাকে দোষ দিতে সুরু করলেন। আমরা মশাই চুনোপুঁটি। কর্ত্তা ইচ্ছা কর্ম্ম। উপর থেকে যা আদেশ পাই তাই করি।

শ্যামল বললে, এখানে আমাদের দৈনন্দিন জীবন ত আপনার নখ দর্পণে। তবু কেন মিথ্যে রিপোর্ট দিয়ে নাজেহাল করছেন, ভেবে ঠিক করতে পারছি নে।

শশী সহসা গলার স্বর বদলে, বললে, ভাবছেন কেন শ্যামলবাবু। নাজেহাল আপনাকে আরো অনেক হতে হবে। এই ত সবে সুরু।

শশী চলে গেল।

কথাটা সহসা শ্যামলের মনে পড়ল। তবে কি উজ্জলাকেও সড়কের ওপাশটাতে বন্দী করে রাখা হয়েছে? শ্যামল মাদুরের উপর গুম হয়ে বসে রইল। শশীর রিপোর্টের অর্থ, এবার সে বুঝতে পারল। ঈর্ষ্যা।

অনুকম্পার হাসি ফুটে উঠল শ্যামলের ঠোঁটে। বেচারা শশীভূষণ!

উজ্জলা সবেমাত্র পোর্টিকের নীচে পা দিয়েছে,—শশী এসে তার হাতে আদেশপত্রখানি দিল।

কী ওটা? উজ্জলা বললে।

শশী আজ স্থির করে এসেছিল, উজ্জ্বলার সঙ্গে সে আর নরম হয়ে কথা বলবে না। কিন্তু উজ্জ্বলার সামনে এলে অজ্ঞান্তেই তার গলার স্বর বিহ্বল হয়ে আসে। বললে, পড়েই দেখুন উজ্জ্বলাদেবী।

উজ্জ্বলা কাগজখানির উপর বারেক চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললে, তার মানে রাস্তার ওপাশে যেতে হলে আমাকে permissionএর জন্ম থানায় লিখতে হবে? সাবাস্!

শশী মাথা চুলকাতে লাগল।

উজ্জ্বলা বললে, কিন্তু আমাকে যখন এ গ্রামে পাঠানো হয়, তখন ত সারা পাহাড়পুর থানায় আমার অবাধ অধিকার ছিল!

শশী বললে, তা হয়ত ছিল। কিন্তু আজ থেকে এই নতুন আদেশ জারী করা হয়েছে।

এ অন্যায় আদেশ আমি মানব না। উজ্জ্বলা চিঠিখানি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে নীচে ফেলে দিল।

শশী বললে, আপনি মিছিমিছি রাগ করছেন। চিঠি ছিঁড়লেই ত আর সরকারী নিষেধাজ্ঞা রদ্ হবেনা, উজ্জ্বলাদেবী!

উজ্জ্বলা দীপ্ত স্বরে বললে, এক্ষুণি আমি রাস্তার ওপাশে যাব। আমাকে এ্যারেষ্ট করতে পারেন।

উজ্জ্বলা সত্যিসত্যিই রাস্তার দিকে যেতে লাগল।

উজ্জ্বলা দেবী! শশী পেছন থেকে বললে, আপনি বিদুষী ও বুদ্ধিমতী। আপনাকে—আপনার সঙ্গে দুটো কথাও যে বলতে পারছি, এতে নিজেকে ধন্য মনে ভাবছি। জানি আপনি কোন দিন আমাকে বন্ধু হিসাবে দেখবেন না। তবু আমি বন্ধু ভাবেই আপনাকে অনুরোধ করব, এ কাজ করবেন না। সরকারী আদেশ লঙ্ঘন করে আপনি যদি শ্যামলবাবুর সঙ্গে রাস্তার ওপাশে দেখা করতে যান, সুশীবাবুর মত ওকেও এখান থেকে সরিয়ে নেওয়া হবে।

শশীর দীর্ঘ বক্তৃতা শুনে উজ্জ্বলা আর এগোল না। সত্যি বলতে

কি এত কথা সে ভেবে দেখেনি। শ্যামলের সঙ্গে উজ্জ্বলার মেলামেশাটা বন্ধ করাই যে শশীর অন্যতম উদ্দেশ্য, উজ্জ্বলার বুঝতে দেরী হয় না এবার।

তা'লে, উজ্জ্বলা শশীর দিকে তাকিয়ে বললে, তা'লে আমাদের মেলা-মেশাটা বন্ধ করাই আসল উদ্দেশ্য?

শশী বললে, তাইত মনে হয়। আপনি ও শ্যামলবাবু পাছে এখানেও একটা দলবল করে হাঙ্গামা করেন তাই সরকার বাহাদুর,—

তাই বলুন। এমনভঙ্গীতে কথাটা উজ্জ্বলা বললে,—শশীর ভয় হল উজ্জ্বলা তার আসল উদ্দেশ্য জেনে গেছে।

ইতস্তত করে শশী বললে, এ ব্যাপারে আমার হাত নেই, উজ্জ্বলাদেবী। বলতে বলতে তার স্বরটা করুণ হয়ে এল, বিশ্বাস করুন, আপনাকে সাহায্য করতে পারলে আমি নিজেকে ধন্যজ্ঞান করব। যখনই শ্যামলবাবুর সঙ্গে আপনার দেখা করবার ইচ্ছা হবে, আমাকে বলতে দ্বিধা করবেন না। থানা থেকে আমি permission এনে দোব।

ধন্যবাদ। উজ্জ্বলা বললে।

শশীর আসল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ রইল না তার। সহসা সে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল; দূর হয়ে যান আমার এখান থেকে! get out!

ইঁদুরের উৎপাত কদিন বেড়ে গেছে। শ্যামলের গায়ের উপর দিয়েও তারা যাতায়াত করতে ভয় পায় না। মাদুরে শুয়ে শুয়ে সে ঘরের অপর পার্শ্বে বাচ্চা ইঁদুরের খেলা দেখে। উজ্জ্বলা পিসীমার সাহায্যে একজন রান্নার লোক জুটিয়ে দিয়েছিল। তা না হলে, এই কদিন হয়ত শ্যামলকে না খেয়েই থাকতে হত। প্রায়ান্ধকার ঘরের নির্জ্জনতা শ্যামলের বুক চেপে বসে আছে যেন। আহার, স্নান কিছুই ভাল লাগে না। মাদুরে শুয়ে শ্যামল ভাবে, সাইবেরিয়ার নির্ব্বাসিত বন্দীরাও কি এমন করে দিন কাটাত!

মাদুরের কোণে অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপির উপর পরতে পরতে ধুলো জমেছে। সেদিকে তাকিয়ে শ্যামলের মনে হয়, উজ্জ্বলার সঙ্গে যেন কতকাল দেখা হয়নি।

বাবু! শ্যামল ফিরে তাকাল। চাকর খেতে ডাকছে।

শ্যামল বললে, আমি এ-বেলা খাবনা, গোকুল।

সে জানি: গোকুল বললে, আজকাল কোন্‌দিন রাতে তুমি খাও? সেজন্য আসিনি।

তারপর কাছার খুঁট থেকে একখানি ভাঁজ করা দুমড়ানো কাগজ সে বের করল। গলার স্বর নামিয়ে বললে; দিদিমণি চিঠিটা তোমায় দিতে বললে। দ্যাখো কাউকে বলনি যেন। ছেলেপিলে নিয়ে ঘর করি, শেষকালে কি পুলিশের খপ্পরে পড়ব?

উজ্জ্বলার চিঠি পড়ে শ্যামল উঠে বসল।

রাত বারোটার পর উজ্জ্বলা তার সঙ্গে দেখা করতে আসবে। জরুরী কথা আছে।

গোকুল বললে, আজ রাতে খাবে ত বাবু?

শ্যামল অন্যমনস্কস্বরে বললে, হ্যাঁ।

আকাশে তারার মালা পৃথিবীর দিকে চোখ মেলে তাকিয়ে আছে। সাতদিন। দীর্ঘ সাতদিন পরে আজ আবার উজ্জ্বলার সঙ্গে দেখা হবে। শ্যামল উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

কুয়াশার মত পাতলা অন্ধকারে কাছের মানুষও চেনা যায় না। শশী কি এখনো রাস্তায় দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে? কে জানে!

অবশেষে উজ্জ্বলা এল। মিটিমিটি হ্যারিকেন ল্যাম্পের আলোয় অনেকক্ষণ তারা চুপচাপ বসে রইল।

উজ্জ্বলাই নীরবতা ভাঙল প্রথম। বললে, এমন করে চোরের মত

গভীর রাতে তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসব কখনো ভাবিনি। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত একবার না এসে পারলাম না। কালই আমি এখান থেকে পালিয়ে যাচ্ছি।

কালই ? শ্যামল শুধু বললে।

—এত কাছে থাকব অথচ দিনের পর দিন আমাদের দেখা হবে না, এ আমি সইতে পারি না। এর চেয়ে এখান থেকে চলে যাওয়াই ভাল।

শ্যামল উত্তর দিল না।

উজ্জ্বলা আস্তে আস্তে বললে, জানি তুমি একা পড়ে যাবে। কিন্তু—,

শ্যামল বললে, না গেলেই কি নয় উজ্জ্বলা ?

এখানে থেকেই বা কি করব ? উজ্জ্বলা বললে।

শ্যামল বলল, তবু তুমি কাছে আছ একথা ভাবতেও ভাল লাগে।

উজ্জ্বলা এক মুহূর্ত্ত চুপ করে রইল! তারপর ফিস ফিস করে বললে, সত্যিই কি তুমি চাও আমি থাকি ?

শ্যামল মাথা নাড়ল, হঁ্যা। তোমাকে আমার কত যে দরকার এই কদিনে যেন নতুন করে জেনেছি।

উজ্জ্বলা উঠে দাঁড়াল। শ্যামল কি জানে না এই মুহূর্ত্তটার জন্য দিনের পর দিন, বছরের পর বছর সে অপেক্ষা করেছে। উজ্জ্বলা শুধু জানতে চেয়েছিল শ্যামল তাকে চায়। উজ্জ্বলা শুধু শুনতে চেয়েছিল, শ্যামলের তাকে দরকার। উজ্জ্বলার চোখের পাতা ভিজে এল। হ্যারিকেনের মিটিমিটি আলোয় শ্যামল দেখতে পায়নি।

শ্যামল বলতে লাগল, এই কদিন আমার কি মনে হচ্ছে জান ? আমরা দুজন একসঙ্গে থাকলে ঢের বেশী কাজ করতে পারব।

উজ্জ্বলা শুধু মাথা নাড়ল উত্তরে ; হঁ্যা।

একটু পরেই সে উঠে দাঁড়াল।

শ্যামল বললে, আমি এগিয়ে দিচ্ছি।

উজ্জ্বলা হেসে বললে, থাক। আবার যদি শশীভূষণ দেখতে পায় মুস্কিল বাধাবে। ক'টা দিন সবুর কর বিয়েটার অনুমতি এসে যাক।

শ্যামল ও উজ্জ্বলার বিয়েতে কর্তৃপক্ষ সঙ্গে সঙ্গেই অনুমতি দিলে।

বিয়েটা পিসীমার বাড়ীতেই সম্পন্ন হল। পুলিশ অফিসার পুলিনবাবু খুসী হল। কারণ তার ধারণা ছিল, বিপ্লবীদের এ-পথ থেকে সরাতে হলে, তাদের বিয়ে দিতে হয়। একবার ঘরের টান জন্মালে, আর পথের পানে ছুটবে না তারা।

বেচারা শশী! উজ্জ্বলা ও শ্যামল এরপর আর কোনোদিন তার মুখ দেখেনি।

বিয়ের পরই শ্যামল ও উজ্জ্বলাকে ইংরাজ সরকার মুক্তি দিল।

শ্যামল বললে, হ্যানিমুনে যাবে?

কোথায়?

শ্যামল জানত, উজ্জ্বলাকে নিয়ে সোনাপুর গেলে কুঞ্জদাদু কত খুসী হবে। বললে; সোনাপুরে কুঞ্জদাদুর কাছে। উজ্জ্বলা এক কথায় রাজী হয়ে গেল।

এগার

শেফালি সত্যিসত্যিই হোষ্টেলে ফিরে এল না দেখে বড়মাসীমা চিন্তিত হল। মেয়েটাকে ওকথা না বললেই হত। শেফালি যে বাড়ী ফিরে গেছে, এ সম্বন্ধে বড়মাসীমার কোন সন্দেহ ছিল না। শেফালি গাঁয়ে গিয়ে যখন বলবে, বড়-মাসীমা তাকে স্বদেশী মিছিলে যাওয়ার জন্য বোর্ডিং থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, সবাই নিশ্চয় তার বদনাম করবে।

আসলে কিন্তু বড়মাসীমা যত না রাজভক্ত ছিল, তার চেয়ে ঢের বেশী নিয়ম তান্ত্রিকতাবাদী ছিল। বোর্ডিংইস্কুলের কোনো মেয়ে স্বেচ্ছাচার করলে বড় মাসীমা ক্ষেপে যায়।

সেদিন দুপুরবেলা অফিসঘরে বসে বড়মাসীমা শেফালির কথাই ভাবছিল। এমনি সময় জনৈক পুলিশঅফিসার এসে হাজির। বড়মাসীমাকে কিছু বলার অবসর না দিয়ে পুলিশ অফিসার একখানি চেয়ারে বসে পড়ল। বললে, আপনার এখানে শেফালি দত্ত নামে একটী মেয়ে আছে—তাকে ডেকে পাঠান kindly।

বড়মাসীমা পুলিশ অফিসারের হুকুম শুনে রেগে গেল। কিন্তু যথাসাধ্য রাগ চেপে বললে, কেন বলুন ত! তার আর সন্দেহ রইল না, শেফালি সেদিন কোন হাঙ্গামা বাধিয়েছে।

পুলিশ অফিসারকে নিরুত্তর দেখে বড়মাসীমা আবার বললে, কি দরকাব? পুলিশ অফিসার বললে, শেফালি দত্তের বিরুদ্ধে রিপোর্ট আছে। মদের দোকানে পিকেটিং করে যে মেয়ে জেল খেটেছে, তাকে বোর্ডিং-ইস্কুলে রেখে আপনি ভয়ানক অন্যায় করেছেন।

বড় মাসীমা চমকে উঠল। ছোট্ট মেয়ে শেফালি পিকেটিং করে জেল খেটেছে, খবরটা এই প্রথম সে শুনলো। শ্রদ্ধা ও করুণায় বড়মাসীমার মন ভরে গেল। স্বদেশী মিছিল দেখলে শেফালি কেন নিষেধ সত্ত্বেও রাস্তায় ছুটে যেত, বড়মাসীমা এবার বুঝতে পারে। শেফালির আচার আচরণ জলের মত স্বচ্ছ হয়ে উঠে, বড় মাসীমার কাছে। আসলে বড় মাসীমার মনের সুকুমার বৃত্তিগুলো একদম মরে যায় নি।

শেফালির প্রতি বড় মাসীমা যে অন্যায় করেছে, আর কোন সন্দেহ রইল না তার।

বড় মাসীমাকে চুপচাপ দেখে পুলিশ অফিসার বলতে লাগল, যা হবার হয়ে গেছে। আমার মনে হয়, শেফালি দত্তকে আর এখানে না রাখাই ভাল। এখানে বেশীদিন থাকলে, আর সব মেয়েদেরও সে দলে টানবে।

আপনার বেয়াদবিতে আমি বিস্মিত হচ্ছি! ফেটে পড়ল বড় মাসীমা। এখান থেকে এক্ষুনি বেরিয়ে যান আপনি।

মানে? পুলিশ অফিসার উঠে দাঁড়াল।

বড় মাসীমা বললে, আমার হোষ্টেলে আমি কোন্ ছাত্রীকে জায়গা দোব না দোব, সে কথা আমি ভাবব। আপনি এখান থেকে বেরিয়ে যান।

পুলিশ অফিসার টুপী মাথায় পরে বললে, ভুলে যাবেন না এটা আধা সরকারী বোর্ডিং ইস্কুল। শেফালি দত্তর সঙ্গে সঙ্গে শেষ পর্য্যন্ত এখান থেকে আপনাকেও যেতে হবে।

পুলিশ অফিসার দরজার দিকে যেতে লাগল।

বড় মাসীমা বললে, চেষ্টা করে দেখুন। তবে শেফালির জন্য ব্যস্ত হবেন না। সে চলে গেছে।

চলে গেছে? পুলিশ অফিসার ফিরে তাকাল, বললে, পিকেটিং করে আবার জেলে গিয়েছে নিশ্চয়!

বড় মাসীমা নীরবে দরজা দেখিয়ে দিয়ে বললে, আপনার কোন কথার জবাব আমি দোব না।

শ্যামলের কথাটা কুঞ্জদাদুর মাথায় ঘোরাফেরা করছিল; শেফালিকে লেখাপড়া শিখতে হবে, নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। কিন্তু বোর্ডিং ইস্কুলে ফিরে যাওয়ার কথা শেফালিকে সে বলতে পারত না। যেখান থেকে মেয়েকে তাড়িয়ে দিয়েছে, সেখানে তাকে আবার পাঠানো যায়ই বা কেমন করে? অথচ মুস্কিল এই যে সহরে মেয়েদের দ্বিতীয় বোর্ডিং ইস্কুল নেই।

এমন সময় এল বড় মাসীমার চিঠি। কুঞ্জদাদুর সমস্যার সমাধান হল। বড় মাসীমা লিখেছে, যা হয়ে গেছে তার জন্য সে দুঃখিত। শেফালি যেন পুজোর পরই হোষ্টেলে ফিরে আসে।

চিঠি পড়ে কুঞ্জদাদুর চোখে জল এল। মাথা নেড়ে বললে, দ্যাখ্ দিদি বড় মাসীমা তোকে কত ভালবাসে। ভাল যে তোকে না বেসে পারা যায় না রে।

শেফালি কিন্তু বোর্ডিং ইস্কুলে ফিরে যাওয়ার জন্ত তেমন আগ্রহ দেখালে না। কুঞ্জদাদু চিন্তিত হল। ছুটী ত ফুরিয়ে এল দিদি! কুঞ্জদাদু বললে, কবে যাবি তুই?

শেফালি বললে, আমি কোথাও যাব না দাদু! পড়তে আমার ভাল লাগেনা মোটে।

কুঞ্জদাদু হতাশস্বরে বললে; বেশ, লেখাপড়া যখন করবি না, এই মাসেই আমি তোর বে দোব।

শেফালি বললে, ভাল হবে না বলছি দাদু। বিয়ে আমি করব না, আগেই বলে দিচ্ছি।

তোর যা খুসী কর। কুঞ্জদাদু রেগে বললে। তারপর কোদাল কাঁধে নিয়ে মাঠের দিকে রওনা হল।

কিন্তু বেশী দূর তাকে যেতে হল না। শ্যামল ও উজ্জলাকে দেখে কাঁধের কোদাল নীচে ফেলে দিয়ে সে থমকে দাঁড়াল। শ্যামল বৌ নিয়ে আসছে!

কৃষ্ণকান্তিও একদিন এমনি একটী ফুটফুটে মেয়েকে নিয়ে এসেছিল। কুঞ্জদাদুর চোখের উপর আজো দৃশ্য ভেসে উঠে।

....তারপর অনেক বছর কেটে গেছে। তারা আবার আসছে নতুন রূপে। কুঞ্জদাদু ঠিক এখানে দাঁড়িয়েই কৃষ্ণকান্তি ও শ্যামলের মাকে অভ্যর্থনা করেছিল।...

দাদু! শ্যামল ছুটে এসে কুঞ্জদাদুকে বুকে জড়িয়ে ধরল। কুঞ্জদাদু ভেজা গলায় বললে, কই, আমাকে ত কিছু লিখিসনি, ভাই!

একপাশে দাঁড়িয়ে উজ্জলা এদের মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখছিল। শ্যামল বললে, লিখবার আর সময় পেলাম কোথায়, দাদু!

তারপর উজ্জলাকে দেখিয়ে বললে, একে চিনতে পার? উজ্জলা—তোমার নাতবৌ, দাদু।

উজ্জ্বলা স্মিত মুখে দুহাত তুলে নমস্কার করল। বললে, কেমন আছেন দাদু ?

কুঞ্জদাদু সে কথার উত্তর না দিয়ে শ্যামলকে বললে, শ্যাম! নাতবৌ দেখে সত্যিই আমার হিংসে হচ্ছে ভাই!

উজ্জ্বলা ইচ্ছে করেই দুপা এগিয়ে কুঞ্জদাদুর পাশে এসে দাঁড়াল।

শ্যামল কুঞ্জদাদুকে বললে; একি, উজ্জ্বলা যে সত্যি সত্যিই তোমার পাশে গিয়ে দাঁড়াল, দাদু!

তারপর হেসে বললে; দাদুর পাশে তোমাকে চমৎকার মানিয়েছে উজ্জ্বলা।

কুঞ্জদাদু বললে, মুখে ত বলছিস, ইদিকে ভেতরে নিশ্চয়ই হিংসেয় ফেটে মরছিস।

উজ্জ্বলা ফোঁড়ন দিল, করুক না হিংসে।

কুঞ্জদাদু স্মিতহেসে বললে, অত সইবে না গো নাতবৌ। কর্তাটীর পাশে গিয়েই দাঁড়াও।

তারপর একটু থেমে বলতে লাগল, বছরের পর বছর স্বপ্ন দেখেছি শ্যাম আমার নাতবৌ নিয়ে আসছে। টুকটুকে রাঙা নাতবৌ। আজ তোমাকে দেখে আমার কল্পনাও হার মেনেছে। সত্যি বলছি, তুমি আমার স্বপ্নের নাতবৌএর চেয়েও সুন্দরী।

উজ্জ্বলা বললে; লজ্জা দেবেন না দাদু। মাকালফলও দেখতে সুন্দর হয়।

কুঞ্জদাদু বললে, না দিদি, তুমি সত্যিই উজ্জ্বলা। এস, ঘরে এস নাতবৌ।

কুঞ্জদাদু আগে আগে যেতে লাগল। শ্যামল ও উজ্জ্বলা তার পেছনে। উঠানে ঢুকেই কুঞ্জদাদু শেফালিকে ডাকতে লাগল, শেফালি—ও শেফালি।

যাই দাদু! শেফালি রান্নাঘর থেকে সাড়া দিল।

দেখ না এসে শ্যামলদা কাকে নিয়ে এসেছে। কুঞ্জদাদু বললে।

ততক্ষণ তারা ভেতরের বারান্দায় এসে গেছে। শেফালি রান্নাঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এল। কিন্তু উজ্জ্বলার দিকে দৃষ্টি পড়তেই পলকে সে যেন জমে গেল।

শ্যামলদার কথা ভুলে গিয়ে অভিভূতের মত সে উজ্জ্বলার দিকে তাকিয়ে রইল।

শেফালির ভাবান্তর কারো দৃষ্টি এড়াল না। উজ্জ্বলা ও শ্যামলের চোখা-চোখি হল।

কুঞ্জদাদু বললে, চিনতে পারিসনি? বোকা, তোর বৌদি।

বৌদি! শেফালি শুধু বললে।

উজ্জ্বলাই এগিয়ে এল। শেফালির সঙ্গে ভাব করবার চেষ্টা করে সে বললে, তোমার কথা এত শুনেছি, দেখা হওয়ার আগেই তোমার সাথে পরিচয় হয়ে গেছে, ভাই শেফালি।

উত্তরে শেফালি একটী কথাও বললে না। মাথা নীচু করে অপরাধীর মত সে দাঁড়িয়ে রইল।

শ্যামল হেসে বললে, বিয়েতে নেমন্তন্ন করিনি বলে, শেফালি আমাদের উপর বেজায় চটে গেছে।

এবার শেফালি আর সহ্য করতে পারে না, ছুটে নিজের ঘরে চলে যায়।

কুঞ্জদাদু মাথা নেড়ে বললে, বেচারা! একটু খানি স্নেহের কাঙ্গাল। এস নাতবৌ, ঘরে এস। হাত মুখ ধুয়ে মুখে কিছু দাও।

উজ্জ্বলা স্মিতমুখে বললে, আপনি ব্যস্ত হবেন না, দাদু।

কুঞ্জদাদু বললে, ব্যস্ত। না গো ব্যস্ত আমি হইনি। আজো আমার স্পষ্ট মনে পড়ে, শ্যামলের মা ঠিক ঐ কথা বলেছিল। দিনগুলো কোথায় হারিয়ে গেল! কিন্তু যাকগে। বেশী কথা বলে আর তোমাদের আটকে রাখব না। পথশ্রমে তোমরা নিশ্চয়ই ক্লান্ত।

নিজের ঘরে বসে শেফালি তখন দুহাতে মুখ ঢেকে নীরবে কাঁদছিল। শ্যামলদা, দেশের জন্য জীবন যার উৎসর্গীকৃত, সেই শ্যামলদা কোনদিন বিয়ে করতে পারে, ছোট শেফালি ভাবতেও পারে নি। তার সমস্ত মন উজ্জ্বলার প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন হয়ে উঠল। এই মেয়েটি, যে তার শ্যামলদাকে কেড়ে নিয়েছে, জীবনে কোনদিন শেফালি তাকে ক্ষমা করবে না।

কিন্তু উজ্জ্বলা তার স্বভাবসুলভ মধুর ব্যবহারে দুদিনেই শেফালির বিরুদ্ধ মনোভাব বিদূরিত করল! কিন্তু সে দূরে দূরেই রইল। উজ্জ্বলা কিছুতেই তাকে কাছে টানতে পারল না।

উজ্জ্বলা বিস্মিত হল। কুঞ্জদাদু বললে, আর বল কেন। ওর মন মেজাজ বোঝা আমার অসাধ্য! মদের দোকানে পিকেটিং করলে। চেনা লোক থানার দারোগা, ছেড়ে দিতে চাইলে। কিন্তু জেলে সে যাবেই। হাসিমুখে একুশদিন জেল খাটলে। শেফালি এখন দূরে দূরে আছে বলে দুঃখ করছ নাতবৌ, কিন্তু যখন ও কাছে আসবে, ওর আবদারের ঠেলায় তিষ্ঠানো দায় হয়ে উঠবে।

বিকালবেলা বসবার ঘরে জড় হয়ে তারা গল্প করছিল।

শ্যামল বললে, কিন্তু লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে এমন করে বাড়ী বসে থাকাটা মোটেই ওর উচিত হয় নি।

কুঞ্জদাদু বললে, সেকথা কে ওকে বোঝাবে শ্যাম?

শ্যামল বললে ঐ বোর্ডিং-ইস্কুলে যাওয়া যদি না হয়, অন্যত্র বন্দোবস্ত করা যাবে'খন। কিন্তু লেখাপড়া ওকে করতেই হবে।

তুমি ত সবকথা জাননা শ্যাম, কুঞ্জদাদু বললে ঐ বোর্ডিং ইস্কুলেরই সুপারিনটেন্-শেফালিকে ফিরে যাবার জন্য নিজে যেচে লিখেছেন। কিন্তু শেফালির সেই এককথা, বোর্ডিংইস্কুলে যাবনা।

শেফালি শ্যামল ও উজ্জ্বলার জন্য চা নিয়ে এল। শ্যামল বললে, এরি ভেতর চা করেছ? একেই বলে লক্ষ্মী মেয়ে।

শেফালি চা দিয়ে নীরবে চলে যাচ্ছিল।

উজ্জলা বললে, একি! চললে কোথায়! বস এখানে।

শেফালি ফিরে তাকাল। বললে, কিছু বলবেন?

শ্যামল বললে; হুঁ। আমরা কি ঠিক করেছি জান শেফালি? আমরা স্থির করেছি তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাব কলকাতায়। সেখানে ন্যাশন্যাল ইস্কুলে তোমায় ভর্ত্তি করে দোব।

এত বড় একটা সংবাদ শুনেও শেফালির কোন ভাবান্তর দেখা গেল না। নীরবে দাঁড়িয়ে রইল সে।

যাবে না কলকাতায়? উজ্জলা প্রশ্ন করল।

না। শেফালি বললে; দাদুকে ছেড়ে অতদূরে যাওয়া হবে না। কুঞ্জদাদু অপরাধীর মত শ্যামলও উজ্জলার দিকে তাকাল। কিন্তু শেফালি ততক্ষণ ওঘরে চলে গেছে।

আম বাগানের ফাঁকে থালার মত মস্তবড় চাঁদ। কোন একটি গাছের ডালে পাতার আড়ালে বসে কোকিল ডাকছে; কু-হুঁ-উ, কু-হুঁ-উ। সহরের মেয়ে উজ্জলা মুগ্ধ হয়ে যায়। এই স্নিগ্ধ রজতধারার সাথে কোকিলকণ্ঠ যে ঐক্যতান তুলেছে, শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের ঐক্যতান বাদনও এর কাছে হার মানে। ঘর থেকে বেরিয়ে উজ্জলা আস্তে আস্তে আমবাগানের দিকে হাঁটতে লাগল। অদৃশ্য কোকিলকণ্ঠ যাদুমন্ত্রের মত তাকে টানছিল। সহসা কানের কাছে কোকিলকণ্ঠ শুনে উজ্জলা চমকে ফিরে তাকাল। সামনে দাঁড়িয়ে শ্যামল মিটিমিটি হাসছে।

তুমি! উজ্জলা বললে।

শ্যামল বললে, তুমি বুঝি ভাবলে সত্যি সত্যিই কোকিল তোমার সঙ্গে মিতালি করতে এল!

উজ্জলা বললে; তা আর ভাবব না। কিন্তু তুমি ত বেশলোক!

এখানে আড়ি পেতে বসে আছ আর আমি তোমায় খুঁজে খুঁজে হয়রান !

শ্যামল বললে ; একদণ্ডও চোখের আড়াল করতে পার না যে। হারিয়ে যাবার ভয় আছে নাকি ?

সে তুমি কি করে জানবে ? উজ্জ্বলা বললে ; কখনো ত ভালবাসনি।

উজ্জ্বলা, শ্যামল বললে, এমন রাতটা ঝগড়া করে মাটি করো না।

করো না ঝগড়া ! উজ্জ্বলা বললে ; আমি তৈরী।

আগেভাগেই আমি পরাজয় মানছি, উজ্জ্বলা।

অমনি পরাজয় মানলেই হল আর কি ! উজ্জ্বলা বললে ; আমার কথার উত্তর দাও, এখানে কি করছিলে ?

উজ্জ্বলা ও শ্যামলকে এ-ঘর ও-ঘর খুঁজে পুকুরঘাটের দিকে যেতে লাগল শেফালি,। পুকুরঘাট থেকে সে আমবাগানের পথ ধরল। খানিক যেতেই সে দেখলে, মাঝখানকার সেই উঁচু ঢিবিটার উপর উজ্জ্বলা ও শ্যামল দাঁড়িয়ে আছে !

শেফালি থমকে দাঁড়াল। কি জানি কেন, এগিয়ে ওদের সামনে যেতে সে সঙ্কোচ বোধ করে।

কে—কে ওখানে ? দেখতে পেয়ে উজ্জ্বলা বললে।

শেফালি এবার এগিয়ে এল, বললে ; আমি। দাদু বললেন, রান্না হয়ে গেছে।

তাই নাকি ! শ্যামল বললে ; তা'লে দেরী করে লাভ কি। এস উজ্জ্বলা, খাওয়া দাওয়ার পর তুমি আমি আর শেফালি তিনজনে মিলে আমবাগানে অনেক্ষণ ধরে বেড়াব আজ। কি বল শেফালি ?

শেফালি উত্তর দিল না। উজ্জ্বলা তার হাত ধরে বললে ; চল। শ্যামল ও উজ্জ্বলা কাল চলে যাবে, তাই কুঞ্জদাদু আজ নিজের হাতে পাঁচরকম

রান্না করেছে। মাছ, মাংস, নিরামিস, কিছুই বাদ যায় নি। চমৎকার রান্না করে কুঞ্জদাদু। তরকারীর সংখ্যা দেখে উজ্জ্বলা বললে, এত সব খাবে কে দাদু?

একদিন বইত নয়। কুঞ্জদাদু হেসে বললে; একদিন না হয় একটু বেশী করে খেলে নাতবৌ?

উজ্জ্বলা কুঞ্জদাদুকে সাহায্য করতে লাগল।

বারান্দায় শ্যামল, আকাশে মেঘের খেলা দেখছে। শেফালি গোয়ালের দিকে যাচ্ছিল, শ্যামল তার পিছু পিছু উঠানে নেমে এল। বললে, সত্যি করে বলত শেফালি, আমাদের উপর রাগ করে আছ কেন?

শেফালি নির্লিপ্তস্বরে বললে, রাগ করব কেন শ্যামলদা।

কিন্তু, শ্যামল বললে, তুমি আগেত এমনধারা ছিলে না শেফালি। তোমার হাসি-গান কলকণ্ঠ ঝর্ণাকেও হার মানাত। আমাব কাছে লুকিয়ো না বোন, কি হয়েছে তোমার?

কই কিছু হয়নি ত। শেফালি বললে; গোয়ালের দরজাটা দিয়ে আসি!

শ্যামল শেফালির নির্লিপ্তস্বরে ব্যথিত হল। কিন্তু আর কিছু সে বললে না। রান্নাঘরের বারান্দা থেকে উজ্জ্বলা ডাকল, যায়গা করা হয়েছে। খেতে এস তোমরা।

উজ্জ্বলা ও শ্যামল চলে গেছে। বাড়ীটা নিথর, থমথমে। শেফালী ও কুঞ্জদাদু দুজনেরই বুক ভারী হয়ে উঠেছে। সকালবেলা কুঞ্জদাদু বারান্দায় বসে তামাক টানছিল। বললে; নাতবৌ আমার, যেমন রূপ, তেমনি গুণ। নামটিও বেশ। ওরাও চলে গেল, বাড়ীটা ও অন্ধকার হল।

কুঞ্জদাদু নিঃশ্বাস ছাড়ল।

পাশে বসে শেফালি তকলি কাটছিল।

দাদু! শেফালি আস্তে আস্তে বললে; আমি বোর্ডিংইস্কুলে ফিরে যাব, দাদু।

সত্যি বলছিস, এ্যাঁ? কুঞ্জদাদু খুসীরস্বরে বললে; শেষ পর্য্যন্ত সুমতি তোর হবেই আমি জানতুম।

বারো

কলকাতায় ফিরে শ্যামল দেখল, পার্টির অনেকেই জেলে। ইংরাজ সরকারের আদালতের বিচারে যাদের জেল হয়েছে তাদের ত কথাই নেই, এমন কি যারা ছাড়া পেয়েছে, তারাও অর্ডিন্যান্সের বলে রাজবন্দী হয়ে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য জেলে পচে মরছে। শত শত কর্ম্মী অন্তরীণে আবদ্ধ। শ্যামলের মত দু'একজন যারা বাইরে রয়েছে, তাদের উপর কড়া পাহারা। ইংরাজসরকার, স্পাই, ওয়াচার ও ইনফরমারের সংখ্যা শতগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। নিজেদের চাকরী বজায় রাখবার জন্য, এরা প্রায়ই নিরীহ পথচারীদের নিয়ে টানাটানি করে। দৈনিক কাজের রিপোর্ট একটা ত দেওয়া চাই!

এই অত্যাচারের প্রতিক্রিয়া তরুণ ও যুব সমাজের ভেতর দেখা দিল। সন্ত্রাসবাদ আন্দোলন দল থেকে ব্যষ্টিতে ছড়িয়ে পড়ল।

গান্ধিজীর আইন অমান্য আন্দোলনে আগেই আকৃষ্ট হয়েছিল শ্যামল। পার্টির সঙ্গে এতদিন তার যোগাযোগ ঘনিষ্ট ছিল বলে কংগ্রেস ক্যাম্পে যোগ দেওয়ার দরকার হয়নি। এবার দল ছাড়া হয়ে কংগ্রেসে যোগ দেওয়াটাই দেশের সেবা করবার সহজ উপায় বলে মেনে নিল শ্যামল। শ্যামলের কাছে, সত্য ও অহিংসার প্রতীক মহাত্মাজীর আইন অমান্য আন্দোলনের রোমান্টিক দিকটাই বড় হয়ে দেখা দিল। অহিংসা মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে, ইংরাজের বেয়নেটের সামনে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করা কম রোমান্টিক নয়!

আইন অমান্য আন্দোলনের হাজার হাজার কর্ম্মী তখন জেলে। কংগ্রেস বে-আইনি বলে ঘোষিত ও কংগ্রেস অফিসগুলো তালাবন্ধ।

পাড়ায় ফ্রি-রিডিংরুমে কংগ্রেসসেবীদের একটা গোপন আস্তানা ছিল। গোপনে নিষিদ্ধপুস্তক সরবরাহ করে, জনসাধারণের ভেতর দেশাত্মবোধ জাগিয়ে, তাদের আইন অমান্য আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করত এরা। শ্যামল এদের দলে যোগ দিল।

এদিকে উজ্জ্বলা কলকাতায় ফিরে গৃহস্থালী নিয়ে এমন মাতামাতি সুরু করল যে, শ্যামল রীতিমত অবাক হয়ে গেল। সম্মার্জ্জনী হাতে সিঁড়ি পরিষ্কার করতে ব্যস্ত এ মেয়েকে দেখে কে ভাবতে পারে, বিপ্লবী উজ্জ্বলার কথা? শুধু তাই নয়, রাজনীতি চর্চ্চায় সে সম্পূর্ণ উদাসীন। বিপ্লবীদের কার্য্যকলাপে তার কোন আগ্রহ নেই আর। এ নিয়ে কথা সুরু হলে উজ্জ্বলা আজকাল পাশ কাটিয়ে যায়।

শ্যামল নিরাশ হল। উজ্জ্বলাকে সে যতখানি না স্ত্রী হিসাবে, তার চেয়ে ঢের বেশী কমরেড ও সহকর্ম্মী হিসাবে চেয়েছিল। কিন্তু এ নিয়ে সে মুখ ফুটে উজ্জ্বলাকে কিছুই বললে না।

সেদিন বিকালবেলা বাড়ী ফিরে শ্যামল দেখে বসবার ঘরের দরজা ও জানালাগুলোতে দামী পর্দ্দা ঝুলছে। ঝকঝকে আসবাব পত্রে ঘরখানি সু-সজ্জিত। দু'দুটো দামী সোফাসেট, রেডিয়োগ্রাম। মায় এককোণে পিয়ানো পর্য্যন্ত। মেঝেয় দামী কার্পেট।

ভেতরের দরজা দিয়ে স্মিতমুখে উজ্জ্বলা প্রবেশ করল।

শ্যামল বললে, একি করেছ উজ্জ্বলা! এতসব আসবাব পত্র!

উজ্জ্বলা একখানি সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে বললে, ও-বাড়ীটা ভাড়া দিয়ে দিলাম। তাই ফার্ণিচারগুলো এখানে নিয়ে আসতে হল।

শ্যামল একখানি চেয়ারে বসে বললে; ও!

এক মুহূর্ত্ত শ্যামলের দিকে তাকিয়ে উজ্জ্বলা বললে ; ব্যাপার কি ? মনে হচ্ছে তুমি যেন খুসী হওনি ?

শ্যামল উদাসস্বরে বললে ; তোমার সংসার তোমার ইচ্ছাখুসী সাজাবে, আমার আর কি বলবার আছে। কিন্তু একথা না বলে পারছি নে, ঘরের আবহাওয়াটাকেই তুমি এ্যারিস্টোক্রেটিক করে ফেলেছ ! শ্যামল একটু হাসল। বললে, কে বলবে এখানে ভূতপূর্ব্ব রাজবন্দী দম্পতি থাকে।

উজ্জ্বলা বললে ; রাজবন্দী ছিলাম বলে কি ছেঁড়া কাঁথায় শুতে হবে ? একটু comfortably থাকার ও অধিকার নেই আমাদের ? যাই বল, এটা ত আর অন্তরীণ শিবির না। এ আমাদের নীড়।

শ্যামল বললে, কিন্তু নীড় ভাঙতে কতক্ষণ, উজ্জ্বলা ?

উজ্জ্বলা উঠে দাঁড়াল ! বললে ; যখন যা হবে, তখন তা হবে। ভবিষ্যতের কথা ভেবে আমি বর্ত্তমান নষ্ট করতে চাইনে।

উজ্জ্বলা ভেতরের দরজার দিকে যেতে লাগল। পেছন থেকে শ্যামল বললে ; কিন্তু খাটিয়া-গুলো—খাটিয়াগুলে ফেলে দিয়েছ নাকি ? এরা সব এলে বসবে কোথায়, উজ্জ্বলা ?

উজ্জ্বলা ফিরে তাকাল। বললে , সোফায় বসলে ওদের জাত যাবে না। তারপর একটু হেসে বললে, ভয় নেই তোমার। দড়ির খাটিয়াগুলো বৈকুণ্ঠ ছাদে জড় করে রেখেছে। ওরা এলে নামিয়ে আনবে'খন।

বাইরে দাঁড়িয়ে পাঁচু দরজার ছোট্ট গর্ত্ত দিয়ে ভেতরে কি হচ্ছে না হচ্ছে দেখবার চেষ্টা করছিল। বারেক ইতস্তত করে সে কলিংবেল টিপল। ভেতরের দরজা থেকে উজ্জ্বলা ফিরে এল। নব পরিচিতা বান্ধবী মিসেস রায়ের আসবার কথা ছিল।

ভেতরে আসুন। উজ্জ্বলা বললে।

পাঁচু প্রবেশ করল। সেদিনকার ঘটনার পর দু'বছর ও পার হয়নি। শ্যামল ও উজ্জ্বলার পাঁচুকে চিনতে দেরী হয় না।

আরে, পাঁচুবাবু যে! শ্যামল এমন করে তাকে অভ্যর্থনা করল যেন অনেকদিন বাদে কোন পরিচিত বন্ধুকে সে দেখতে পেয়েছে!

ঠাণ্ডা নির্জীবস্বরে পাঁচু, বললে; কেমন আছেন, স্যার?

উজ্জ্বলা হা করে পাঁচুকে দেখতে লাগল। এই অশুভ গ্রহটী আবার কোন সাহসে এ-বাড়ীতে প্রবেশ করল!

বসুন; শ্যামল বললে; অনেকদিন পর আপনাকে দেখলাম।

পাঁচু কিন্তু বসল না। আসবাব-পত্রগুলোর উপর বারেক চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললে; ঘরটা বেশ সাজিয়েছেন দেখছি।

হাঁ। উত্তর দিল উজ্জ্বলা; সেদিন ঘরে এসব আসবাব-পত্র কিছুই ছিল না।

পাঁচু একটু থতমত খেয়ে গেল। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে হাসবার চেষ্টা করে বললে; শ্যামলবাবু বাধা না দিলে সেদিন হয়ত আপনারা আমাকে মেরেই ফেলতেন। কিন্তু আপনাদের ধন্যবাদ দিতে হয়, কারণ আপনাদের জন্যই আজ আমার প্রমোশন হয়েছে। কিন্তু সে-কথা থাক! আমি যে-কাজে এসেছি,—

শ্যামল টেবিল থেকে সিগ্রেট কেস তুলে বললে; বিলক্ষণ। সামাজিকতা করতে আপনি আসেন নি, আমরা জানি। সিগ্রেট?

পাঁচু মাথা নাড়ল। বললে; আজ্ঞে না। সিগ্রেট আমি খাইনে।

শ্যামল নিজে একটা সিগ্রেট ধরিয়ে বললে; চরিত্রটা দেখছি আজো আদর্শ রেখেছেন! স্বামী বিবেকানন্দের বাণী এখনো মুখস্থ করেন না কি?

পাঁচু উত্তর দিল না। পকেট থেকে নোট বুক ও পেন্সিল বের করে বললে; আপনার গেল সপ্তার রিপোর্টটা দিতে হবে। মানে আপনার Daily movement। মানে এই ক'দিন আপনি যে সব জায়গায় গেছেন, Nature of business ইত্যাদি।

শ্যামল বললে; ডায়েরি লেখার অভ্যাস আমার নেই।

পাঁচু বললে; মানে, আপনি আমাকে রিপোর্ট দিতে নারাজ?

আপনি ঠিক বুঝতে পেরেছেন। শ্যামল বললে।

এক মুহূর্ত্ত কি ভেবে পাঁচু মোলায়েম স্বরে বললে; আপনি হয়ত ভাবছেন, মিছিমিছি আমি আপনাকে harass করছি। Nothing personal, শ্যামলবাবু। বিপ্লবীদলের ভেতর যাঁরা বাইরে আছেন, তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকেই movement রিপোর্ট নে'য়া হচ্ছে।

রিপোর্ট আমি দোব না, একবার বলে দিয়েছি। শ্যামল বললে।

পাঁচু কি বলতে গিয়ে বারেক ইতস্তত করল। তারপর ঘরের চারদিকে আর একবার তাকিয়ে নিয়ে বললে; সংসারী মানুষ হয়ে trouble ডেকে এনে কি লাভ শ্যামলবাবু। আমি আবার আসব। আপনি ততক্ষণ মনস্থির করুন।

পাঁচু চলে গেল।

রিপোর্ট! তিক্ত-বিরক্ত স্বরে বললে শ্যামল: জেল যেতে হয় যাব তবু রিপোর্ট দোব না।

উজ্জ্বলা এতক্ষণ চুপচাপ ছিল। আস্তে আস্তে শ্যামলের পাশে এসে বসল সে। বললে; ডাক যখন আসবে, আমি তোমায় বাধা দোব না। কিন্তু আমাদের শিশু—সংসারের বয়স আজো তিনমাস হয় নি। এরি মধ্যে তুমি সব কিছু ভেঙ্গে দিতে চাও?

শ্যামল বিদ্রূপের স্বরে বললে; তিনমাসেই তুমি সংসারে যেমন জড়িয়ে পড়েছ, তিনবছর পরে কি যে হবে আমি তাই ভাবি।

উজ্জ্বলা সে বিদ্রূপ গায়ে মাখল না। বললে; আমার সংসারে আমি জড়িয়ে পড়ব না ত কে জড়াবে? কিন্তু তুমি-ই-না বলেছিলে, জেলে যাওয়াটাই বড় কথা নয়? তোমার মত কর্মী বাইরে থাকলে অনেক কাজ করতে পারে।

শ্যামল মাথা নাড়ল। বললে; সে কথা ঠিক। যতই কড়াকড়ি করুক, আমার কলম ত আর এরা বন্ধ করতে পারবে না!

....শেষ পর্য্যন্ত শ্যামলকেও সপ্তাহিক রিপোর্ট দিতে হল! শুধু উজ্জ্বলার অনুরোধেই নয়, বাইরে থাকার আগ্রহ শ্যামলের নিজেরও কিছু কম ছিল না। কিন্তু আপদ যদি সেখানেই চুকে যেত! সময়ে অসময়ে পাঁচু কিম্বা অন্য কোন সি-আই-ডি এসে তাকে জ্বালাতন করতে লাগল।

"আপনার রিপোর্টের সঙ্গে আমাদের ডিপার্টমেণ্টের রিপোর্ট মিলছে না। থানায় যেয়ে আপনাকে position clear করতে হবে।"

মাঝে মাঝে শ্যামল বেঁকে বসে। মানুষের সহ্যের একটা সীমা আছে। একথা কে না জানে, ওয়াচারেরা পদোন্নতির জন্য রিপোর্টে মিথ্যে কথা লিখে। পাঁচু বলে; Nothing personal শ্যামলবাবু। বাইরে থাকতে হলে মাঝে মাঝে থানায় যেয়ে আপনাকে position clear করে আসতে হবেই।

তিক্ত-বিরক্ত মন নিয়ে শ্যামল দিন কাটাতে লাগল। উজ্জ্বলার সংসারের কোন কিছুতে শ্যামলের আগ্রহ নেই। বাড়ীতে অধিকাংশ সময়ই সে থাকে না। যতক্ষণ থাকে, নিজের ঘরে বসে লিখে। বাইরে কোথায় যায়, কি করে—দৈনন্দিন কর্ম্মসূচী সম্বন্ধে উজ্জ্বলাকে সে কিছুই বলে না। এমন কি রচনার পাণ্ডুলিপি নিয়েও আজকাল শ্যামল উজ্জ্বলার সঙ্গে আলোচনা করে না।

প্রথম দু'একদিন উজ্জ্বলা এ নিয়ে কলহ করবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত উজ্জ্বলা ভাগ্যের সঙ্গে আপোষ করে নিল।

শ্যামল যদি আপনাতে আপনি মগ্ন হয়ে সুখী হয়, উজ্জ্বলা তাকে বাধা দেবে না। শ্যামলের সুখই ত তার সুখ। স্বামীর যে-টুকু সান্নিধ্য স্বতঃস্ফূর্ত্ত সে পায়, তাতেই সে সন্তুষ্ট থাকবে।

কিন্তু দিনের পর দিন শ্যামল দূর থেকে আরো দূরে সরে যেতে লাগল।

প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। উজ্জ্বলা, সংসার বৈকুণ্ঠের হাতে ছেড়ে, পার্টি ও সোসাইটী নিয়ে মেতে উঠল।

উজ্জ্বলার চরিত্রের একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, যখন যা ধরে, তার শেষ দেখা চাই ওর। পাড়ায় 'ঘরকন্না ক্লাব' বলে—অভিজাত মহিলাদের একটী ক্লাব আছে। এর প্রতিষ্ঠাত্রী মিসেস রায়, আই সি এস গৃহিণী। এবং বাকী সব সভ্যাই, ব্যবসায়ী কিম্বা গেজেটেড অফিসারে স্ত্রী। এরা প্রত্যেকেই স্বচ্ছলতা ও বিলাসিতার এক একটী জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি। বলা বাহুল্য, ঘরকন্না ক্লাবে ঘরকন্নার আলোচনা ছাড়া আর সবকিছুই হত। পিক্‌নিক্‌, এস্‌কারসন, পার্টি, গানবাজনা, নৃত্যকলা—এসব ছিল ঘরকন্না ক্লাবের সাপ্তাহিক প্রগ্রাম। বন্যা, দুর্ভিক্ষ কিম্বা এ্যাম্বুলেন্স কোর-এ সাহায্য করবার জন্য এরা মাঝে মাঝে চ্যারিটী শো সংগঠন করত। কিন্তু অনুষ্ঠানের পর হিসাব-নিকাশ মিলিয়ে দেখা যেত চ্যারিটী করবার মত কিছুই বাঁচেনি শেষ পর্য্যন্ত।

ঘরকন্না ক্লাবের নিত্যকার প্রগ্রাম ছিল—বাড়ী, গাড়ী ও শাড়ীর সমালোচনা। এই তিনটার লেটেস্ট মডেল নিয়ে সোসাইটীলেডিরা প্রচুর গবেষণা ও তর্ক করত। তারপর বেনারসী পরে কে রিকসো চড়ে, জড়োয়া গহনা পরলে কাকে ক্লাউনের মত দেখায়, ইত্যাদি মুখ রোচক আলোচনা ত আছেই।

বড়লোকের মেয়ে উজ্জ্বলা; কিছুদিনেই ঘরকন্না ক্লাবের একজন বিশিষ্ট সভ্যাহয়ে উঠল। উজ্জ্বলা না এলে আড্ডাই জমে না। দুদিন অনুপস্থিত থাকলে, ক্লাবের অনেকেই ছুটে তার বাড়ীতে,—উজ্জ্বলার খোঁজ-খবর নিতে।

তবু, মাঝে মাঝে উজ্জ্বলার মন বিদ্রোহ করে বসত। স্বামী উদাসীন হয়ে দূরে সরে গেছে বলে কি সেও দূরে সরে থাকবে!

সেদিন অনেক রাত অবধি শ্যামল ড্রইংরুমে বসে লিখছিল। উজ্জ্বলা ঘরে ঢুকে বললে; সাড়ে বারোটা, শুতে যাবে না?

শ্যামল একটা সিগ্রেট ধরিয়ে বললে ; দেরী আছে।

উজ্জ্বলা আর একটী কথাও বললে না। শোবার ঘরে ফিরে গেল।

সকালবেলা শ্যামলের যখন ঘুম ভাঙ্গল, বেশ খানিকটা বেলা হয়ে গেছে। মুখ ধুয়ে ছুটে গেল সে খাবার ঘরে। উজ্জ্বলা গম্ভীর মুখে খবরের কাগজ হাতে নিয়ে বসেছিল। শ্যামলকে সে দেখেও দেখল না। শ্যামল বসে পড়ল একখানি চেয়ারে। বললে, চা খেয়েছ উজ্জ্বলা? উজ্জ্বলা উত্তর দিল না। শ্যামল বললে, আমার উপর রাগ হয়েছে?

রামো! উজ্জ্বলা এতক্ষণে কথা বললে: তোমার উপর কি কখনো রাগ করতে পারি? পতি পরম গুরু। সারাদিন তুমি থাকবে বাইরে, বন্ধু-বান্ধবদের আড্ডায়। আর সারারাত লেখা পড়া নিয়ে। আর কাব্যের উপেক্ষিতা আমি তোমার পথ চেয়ে বসে আকাশের তারা গুণব। তাই না?

শ্যামল বিরক্ত হল। বললে; এ তোমার অন্যায় উজ্জ্বলা। তুমি কি চাও আমি তোমার আঁচল ধরা হব? তুমি যে তোমার ঘরকন্না ক্লাব নিয়ে সব সময় মেতে আছ, কই, অমি তোমায় কোনদিন কিছু বলেছি?

উজ্জ্বলা ঠোঁট কামড়ে ক্রোধ চেপে বললে: তুমি আমায় কিছু বল না বলে, অমিও তোমায় কিছু বলব না? বিয়ের আগে ত সে রকম কোন 'প্যাক্ট' ছিল না। আর, এতই যদি, অগেই বল নি কেন?

শ্যামল রেগে বললে; কী এত? কী বলব আগে! I am fed up!

চা না খেয়েই সে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

তের

শেফালি বোর্ডিং ইস্কুলে ফিরে এসেছে। আগের সেই চঞ্চলতা, সেই দুরন্তপনা আর নেই শেফালির। দেখে মনে হয় যেন বুড়িয়ে গেছে। শান্ত ও গম্ভীর তার এই নতুনরূপ দেখে শুধু বোর্ডিংএর মেয়েরাই নয়, বড় মাসীমা ও বিস্মিত হয়। উঠতি বয়সে মেয়েদের মাঝে মাঝে এমনটা হতে দেখা যায়। শারীরিক পরিবর্ত্তনের সাথে মানসিক পরিবর্ত্তন ও আসে। কিন্তু সে-সময়টুকু ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু শেফালি যেন কেমন ধারা হয়ে গেছে। নিজে থেকে আজকাল সে কারো সঙ্গে মিশে না। এমন কি কেউ মিশতে এলে-ও তেমন সাড়া দেয় না।

ইস্কুলএর ছুটী হয়ে গেলে, শেফালি নিজের ঘরে বসে চরকা কাটে। কখনো জানালায় তাকিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেয়।

এ সহরে আইন-অমান্য আন্দোলনের জোয়ারে যেন একটু ভাঁটা পড়েছে। ছোট সহর, কর্ম্মীরা অনেকেই গেছে জেলে। ছাত্র ও যুব সমাজের রাজনীতি সচেতন যে অংশ বাইরে ছিল, পুলিশের হাতে মার খেয়ে খেয়ে তারাও দমে গেছে। তবু যেন নতুন করে মার খাওয়ার জন্য উৎসাহী তরুণ ও যুবকের দল মাঝে মাঝে মিছিল করে বন্দেমাতরম ধ্বনি তোলে রাস্তায় বের হয়।

জানালা দিয়ে তাদের দেখে শেফালি চঞ্চল হয়ে উঠত। এক একদিন নীচে সদর দরজা পর্য্যন্ত ছুটে যায় সে,—মিছিলে যোগ দেবে বলে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সে রাস্তায় বের হয় না। শেফালি অবশ্য জানে যে মিছিলে গেলে বড়-মাসীমা এবার আর কিছু বলবে না তাকে। বড়-মাসীমার মুখে সি-আই-ডি ইন্সপেক্টারের কথা সে শুনেছিল। সুবিধে পেলেই তারা তাকে দীর্ঘকালের জন্য জেলে আটক রাখবে, বড়-মাসীমা বলত। অবশ্য জেলের ভয় শেফালির ছিল না। কিন্তু কুঞ্জদাদুর কথা

ভেবে সে দমে যেত। সত্যিই সে যদি আবার জেলে যায়, কুঞ্জদাত্ন একেবারে ভেঙ্গে পড়বে।

কুঞ্জদাত্নর কথা তার মনে পড়ে;—শেফালিকে লেখাপড়া শিখে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে।

সন্ধ্যা তখনো হয়নি। শেফালি বিছানায় শুয়ে শুয়ে এসব কথাই ভাবছিল। বড়-মাসীমা ঘরে ঢুকে বললে; অসময়ে শুয়ে কেন শেফালি? অসুখ বিসুখ করেনি ত?

শেফালি বিছানায় উঠে বসল। বড়-মাসীমা আজকাল, শেফালির উপর খুবই সদয়। বড় মাসীমার কাছ থেকে এমন সহৃদয় অন্তরঙ্গ ব্যবহার বোর্ডিং-ইস্কুলের কোন মেয়ে এ-যাবত পায়নি।

শেফালির উত্তরের অপেক্ষা না করেই বড়-মাসীমা বললে; এবার বাড়ী থেকে এসেছিস অবধি একটা দিনের জন্য তোকে প্রফুল্ল দেখলাম না। কি হয়েছে শেফালি?

কিছু হয়নি ত! শেফালি উদাসস্বরে বললে।

বড়-মাসীমা বললে, এখানে ভাল লাগে না বুঝি? বাড়ীর জন্য মন কেমন করে?

না ত। শেফালি উত্তর দিল।

বড়-মাসীমা একটু থেমে বললে; কাল ডক্টর মিস্ কুমুদ আসছেন। আমি ওকে বলে দোব। তোমার শরীরটা উনি পরীক্ষা করবেন'খন।

বড়-মাসীমা বেরিয়ে গেল। নীচে লনে, মেয়েরা ব্যাডমিণ্টন খেলছে। থেকে থেকে তাদের কলকণ্ঠ উপরে ভেসে আসছে। শেফালি আলো জেলে পড়তে বসল।

ত্নদিন উজ্জলা ঘরকন্না ক্লাবে যায়নি। বিকালবেলা, মিসেস রায়, মিসেস্ মুখার্জি ও মিস দত্ত এসে হাজির। উজ্জলা তাদের সমাদর করে বসাল।

পরক্ষণেই বসবার-ঘর গুলজার হয়ে উঠল। ঘরকন্না ক্লাব উজ্জ্বলার ঘরেই উঠে এসেছে যেন।

মিসেস রায় বললে; How cruel of you। আপনাকে ছাড়া একদিন ও আমাদের চলে না, একথা জেনেও আপনি দু দুদিন এলেন না উজ্জ্বলা দেবী!

উজ্জ্বলা হেসে বললে; ঘরকন্নার কাজে একটু ব্যস্ত ছিলাম, ভাই।

মিসেস মুখার্জি বললে; Really! কিন্তু মিসেস বোস, ঘরকন্না ক্লাবে না এলে কখনো ঘরকন্নার কাজ হয়?

রসিকতাটা সবাই প্রাণ ভরে উপভোগ করল!

শ্যামল লাইব্রেরী থেকে ফিরছিল। নতুন বই-এর পাণ্ডুলিপির মাল মশলা সংগ্রহের কাজে কদিন সে ব্যস্ত। ঘরে ঢুকতেই সবার দৃষ্টি পড়ল শ্যামলের উপর।

নমস্কার মিষ্টার বোস।

নতুন কোন বই লিখছেন নাকি?

শ্যামল স্মিতমুখে তাদের অভিনন্দন জানিয়ে বললে, আপনারা বসুন! তারপর নিজে ভেতর চলে গেল।

সবাই উজ্জ্বলাকে চেপে ধরল, শনিবারের পিক্‌নিক পার্টিতে শ্যামলকে বোটানিক্যাল গার্ডেনে নিয়ে যেতে হবে। সেদিন তারা শ্যামলকে প্রধান অতিথি করবে।

উজ্জ্বলা স্মিতমুখে বললে: আপনারা ত আমাকে হুকুম করেই খালাস; কিন্তু উনি কি আসবেন?

কেন আসবেন না শুনি? মিসেস রায় প্রশ্ন করল।

মিসেস মুখার্জি হেসে বললে; কান টানলেই মাথা আসে। আপনি চেপে ধরলেই উনি সঙ্গে আসবেন।

উজ্জ্বলা বললে; উনি নিজের কাজকর্ম নিয়ে দিনরাত এমন ব্যস্ত

থাকেন ভাই; এসব আমোদ-আহ্লাদের ব্যাপারে ওকে টানাটানি করতে ভরসা পাইনে।

On no no. মিসেস রায় বললে; এ আপনার বঝবার ভুল। এমন করে চব্বিশঘণ্টা কাজের ভেতর ডুবে থাকলে শ্যামলবাবুর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়বে। Recreation, ওঁব recreation এর দরকার। আর সত্যি বলতে কি, সে দায়িত্ব আপনাব মিসেস বোস।

of course. of course। মিস দত্ত বললে; শনিবারের পার্টিতে শ্যামল বাবুকে যেমন করে হোক সঙ্গে নিয়ে আসবেন, কথা দিন।

উজ্জ্বলা বললে; কথা আমি দিচ্ছিনে। তবে চেষ্টা করব ভাই।

বলা বাহুল্য, ঘরকন্না ক্লাব ও এর সভ্যাদের সম্বন্ধে শ্যামলের উঁচু ধারণা ছিল না। চেরিটি শোব নামে এরা নিজেদের জয়ঢাক পিটিয়ে বেড়ায়। আব সামাজিকতার নামে করে পরচর্চ্চা! উজ্জ্বলা এদের দলে ভীড়েছে বলে শ্যামলের দুঃখের শেষ ছিল না।

কতবড অভিমানে যে শ্যামল মুখ বুজেছিল, এ শুধু সে নিজেই জানত। কমরেড, সহকর্ম্মী, বিপ্লবী উজ্জ্বলার এই পরিণতি সে কি কখনো কল্পনায় আনতে পারত! একদিন উজ্জ্বলার চোখে সে আগুন দেখেছিল। যে আগুন নিজেকে অবলীলাক্রমে পুড়িয়ে দিয়ে অন্যায় ও অসত্যকে ধ্বংস করে। বিপ্লবের সেই আগুন নিভে গেল? নাকি শ্যামল ভুল দেখেছিল? মোহগ্রস্ত মন নিয়ে মানুষ ত ভুলই দেখে। হয়ত উজ্জ্বলার প্রতি তার দুর্ব্বলতা ছিল, তাই তাকে বিপ্লবী-নায়িকার ভূমিকায় সে বসাতে চেয়েছিল।

নিজের ঘরে বসে শ্যামল এসব কথা ভাবছিল। উজ্জ্বলা এল। বললে, শনিবারে তুমি কোন এ্যাপোয়েন্টমেণ্ট কর না যেন।

শ্যামল প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে উজ্জ্বলার দিকে তাকাল। উজ্জ্বলা বলতে লাগল, শনিবারে বোটানিক্যাল গার্ডেনে ঘরকন্না ক্লাবের পার্টি রয়েছে। তুমি সেদিনকার প্রাধান অতিথি।

শ্যামল সংক্ষিপ্ত করে বললে, আমার পক্ষে তোমাদের কোন পার্টিতে যাওয়া সম্ভব হবে না।

উজ্জ্বলা অনুনয় করে বললে, অন্তত শনিবারটা তোমাকে যেতেই হবে, আমি ওদের কথা দিয়েছি।

শ্যামল সেলফ থেকে একখানি বই টেনে নিয়ে বললে, আমি আমার বক্তব্য বলেছি।

উজ্জ্বলা রেগে বললে, মানে? আমরা কি তোমার চোখে এমনি হেয় যে একটা দিনের আমন্ত্রণ ও তুমি গ্রহণ করতে পার না?

উজ্জ্বলা! শ্যামলের গলার স্বরে উজ্জ্বলা বিস্মিত হল। শ্যামল বলতে লাগল, ঢের হয়েছে, আর নয়।

মানে? উজ্জ্বলা প্রশ্ন করল।

শ্যামল একটা সিগ্রেট ধরিয়ে বললে, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে উজ্জ্বলা। সময় থাকতেই বোঝাপড়া একটা করে নেওয়া ভাল।

বোঝাপড়া! উজ্জ্বলা শান্ত সংযত কণ্ঠে বললে, নাটক করবে না কি?

শ্যামল বললে, নাটক? হ্যাঁ নাটকই বটে। তারপর দৃঢ়স্বরে বললে, কিন্তু এ নাটকের যবনিকা আমি এখানেই টানতে চাই।

উজ্জ্বলা কঠিন হয়ে উঠল। বললে, বেশ। আমি সব কিছুর জন্যই তৈরী।

তৈরী! শ্যামল বার দুই পায়চারি করে ফিরে এসে নিজের চেয়ারে বসল। শান্তস্বরে বললে, উজ্জ্বলা আমি যা বলতে চাই, তা তোমার অজানা নয়। কিন্তু এ রাগের কথা না। তোমাকে আঘাত দেওয়ার জন্যও আমি এ সব কথা বলছি নে। আমরা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম কাজের ভেতর দিয়ে। তারপর সেদিন অন্তরীণ ক্যাম্পে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ায় সময় আমরা প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, বিপ্লবের আগুন জীইয়ে রাখাই হবে আমাদের জীবনের ব্রত। কারণ তখন ছিলাম আমরা একই ব্রতে ব্রতী, একই পথের পথিক। এই পর্য্যন্ত বলে শ্যামল থামল।

উজ্জ্বলা ম্লান হেসে বললে, আর এখন ?

শ্যামল উত্তেজনায় উঠে দাঁড়াল। বললে, তামাসা করবার সময় এ নয় উজ্জ্বলা। এখন, দেশের এই দুঃসময়ে পার্টির জন্য কাজ করবার দায়িত্ব আমাদের কতখানি, তা কি তোমাকে বলে দিতে হবে, উজ্জ্বলা ?

উজ্জ্বলা উদাস স্বরে বললে, তার মানে আমরাও জেলে গিয়ে বসে থাকি। কিন্তু কী লাভ এতে ?

লাভ ক্ষতি তুমি নিক্তিতে ওজন করে দেখছ ? আশ্চর্য্য ! তিক্ত স্বরে বললে শ্যামল। ঘরকন্না ক্লাবে মিশে তুমি এতখানি নীচে নেমে গেছ, আমি কল্পনাও করিনি।

এত বড় আঘাতের পরও উজ্জ্বলা চুপ করে রইল দেখে শ্যামল বিস্মিত হল। বললে, বিপ্লবে কি তোমার আর কোন আস্থা নেই ?

উজ্জ্বলা সেকথার উত্তর না দিয়ে বললে, তোমাকে ছেড়ে, সংসার ছেড়ে আমি জেলে যেতে চাইনে।

শ্যামল বললে, মেয়েরা ঐরকমই হয় ! কিন্তু গোড়ায় ভুল করেছ উজ্জ্বলা। তোমার সংসারের প্রতি আমার কোন টান নেই। সময় যখন আসবে জীর্ণ বস্ত্রের মতই আমি সব ছেড়ে চলে যাব।

উত্তরে উজ্জ্বলা কি বলতে যাচ্ছিল।

টেলিগ্রাম ! বলতে বলতে বৈকুণ্ঠ একখানি টেলিগ্রাম নিয়ে ঘরে ঢুকল। কম্পিত হস্তে শ্যামল খাম খানি খুলতে খুলতে বললে, আমাকে কে আবার কিন্তু সে আর কথা শেষ করতে পারল না। তার ঠোঁট কেঁপে উঠল, কণ্ঠরোধ হয়ে এল। অশ্রু সজল চোখে সে উজ্জ্বলার দিকে তাকাল। উজ্জ্বলা তার হাত থেকে টেলিগ্রামখানি নিয়ে পড়তে লাগল।

কুঞ্জদাদু হার্টফেল করে মারা গেছে। টেলিগ্রাম করেছে বাদশা মিঞা।

কুঞ্জদাদুর স্মৃতি উজ্জ্বলার মনে তখনো সবুজ। দুহাতে মুখ ঢেকে সে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল।

অনেকক্ষণ পরে শ্যামলই প্রথম কথা কইল। বললে, এ আঘাত সে সইতে পারবে না, উজ্জ্বলা। শেফালির যে আর কেউ নেই।

উজ্জ্বলা চোখের জল মুছে বললে, আর কেউ না থাক আমরা ত আছি। তুমি আজই ওখানে যাও। শেফালিকে সঙ্গে করে এখানে নিয়ে এস।

গ্রীষ্মের ছুটীর মাত্র দুদিন বাকী। দিন কয়েকের ভেতর হোস্টেল বন্ধ হয়ে যাবে। মেয়েরা সব যে যার বাড়ী চলে যাবে। তাদের নিয়ে যেতে ইতিমধ্যেই অভিভাবকেরা আসতে সুরু করেছে। কুঞ্জদাদুকে ও আসবার জন্য শেফালি চিঠি লিখল; কিন্তু সে চিঠির উত্তর আর এল না। এল বাদশা মিঞার টেলিগ্রাম।

এত বড় দুঃসংবাদ শেফালি সইতে পারল না। ভেঙে পড়ল সে। বড় মাসীমা তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললে, কাঁদিস নে মা। মনে রাখিস ভগবান যখন দুঃখ দেন দুঃখ সইবার ক্ষমতা ও আমাদের দেন।

শেফালির মন কি প্রবোধ মানে? তার কান্না আরো বেড়ে যায়। বোর্ডিং ইস্কুলে ছুটীর আবহাওয়া;—হাসি গান হুল্লোড়। বাড়ী যাবার আনন্দে মেয়েরা মুখর, উচ্ছল। অভিভাবকদের সঙ্গে সবাই মার্কেটিং করে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

শেফালিকে বাড়ী নিয়ে যেতে কেউ আর আসবে না। আর সে যাবেই বা কোথায়? কেঁদে কেঁদে শেফালি কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম ভাঙতেই সে দেখল, বড় মাসীমা তার পাশে বসে আছে। চোখের জল তার শুকিয়ে গেছল। না, আর সে কাঁদবে না।

বড় মাসীমা বললে; শেফালি, বাড়ী যেয়ে তোমার কাজ নেই। বাড়ীতে যখন কেউ নেই, কেনই বা যাবে ও খানে। তাই আমি ঠিক করেছি, আমার সঙ্গে তুমি শিমুলতলা যাবে।

না মাসীমা, শেফালি বললে, আমি বাড়ীই যাব।

বড় মাসীমা বললে, নাই বা গেলে বাড়ী!

শেফালি আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। বললে, আমার দাদুর ঘরখানি শেষবারের মত দেখে আসব, মাসীমা।

শেফালি সত্যি সত্যিই বাক্স গুছাতে লাগল।

এক মুহূর্ত্ত চুপ করে থেকে বড় মাসীমা বললে, কাউকে সঙ্গে দোব?

না মাসীমা, শেফালি বললে, আমি একাই যেতে পারব।

পরদিন শ্যামল যখন এসে পৌঁছল, শেফালি তখন রওয়ানা হয়ে গেছে।

শেফালির মুখে বড় মাসীমা শ্যামালের কথা শুনেছিল। বললে, বাক্স বিছানা সে কিছুই সঙ্গে নিয়ে যায়নি। তার মনের অবস্থা ত আপনার অজানা নেই। আমি জানিনে এ আঘাত শেফালি সইতে পারবে কি না। কিন্তু সাবধানের মার নেই। আপনি এখুনি একটা ট্যাকসি নিয়ে সোনাপুরে চলে যান।

বড় মাসীমার ইঙ্গিতে শ্যামল শিউরে উঠল। সে আব এক মুহূর্ত্ত ও দেরী করল না। বেরিয়ে এল পথে।

মোটর বাস থেকে নেমে শেফালি দ্রুত এগিয়ে চলল বাড়ীর দিক! যেন দাদু তার জন্য পুকুর ঘাটের পথে দাঁড়িয়ে আছে! সহসা শেফালির মনে হয় টেলিগ্রামটা মিথ্যে। মিথ্যে, মিথ্যে এ টেলিগ্রাম, দাদু কখনো মরেনি। দাদু বেঁচে আছে।

পুকুর ঘাটের পথে এসে শেফালি এক মুহূর্ত্ত থমকে দাঁড়ায়। বিশীর্ণ পাণ্ডুর তার চেহারা। শুকনো এলমেলো চুল হাওয়ায় উড়ছে। শেফালি চারপাশে চোখ বুলিয়ে নেয়!

সারা বাড়ীটা কেমন যেন লক্ষ্মী ছাড়া থমথমে। একটা ভয় ও আশঙ্কা মিশ্রিত অনুভূতিতে তার পা দু'খানি অচল হয়ে আসে। দাদু!

নিঝঝুম নিস্তব্ধ বাড়ীটার দিকে তাকিয়ে তার শেষ বিশ্বাসটুকু ও নষ্ট হয়ে যায়। দাদু আর বেঁচে নেই।

আস্তে খুব ধীরে,—যেন পা টিপে টিপে শেফালি এগিয়ে চলে। ভেতর বাড়ীর উঠানে ঢুকে আর একবার সে চারদিকে চোখ বুলিয়ে নেয়। গোয়ালঘর শূন্য।

ঘরের পেছনের আম ও কাঁঠালগাছ থেকে অসংখ্য ঝরাপাতা পড়ে উঠানটা ভর্ত্তি হয়ে গেছে। ঝরাপাতার উপর নিজের পায়ের শব্দ শুনে শেফালি ফিরে তাকায়। কেউ কোথা ও নাই। শুধু একটি পথের কুকুর বারান্দায় শুয়ে আছে।

শেফালিকে দেখে সে কিন্তু ডাকল না। নীরবে উঠে পালিয়ে গেল। বারান্দার যেখানটায় বসে দাদু কাজ করত, শেফালি সেখানে বারেক দাঁড়ায়, জানু পেতে বসে মাটিতে দুহাত ঠেকিয়ে দাদুর উদ্দেশ্যে প্রণাম করে।

দিদি তুই এলি? কুঞ্জদাদুর গলা শুনে শেফালি চমকে উঠে। পর ক্ষণেই মনের ভুল সে বুঝতে পারে। পাশের বাড়ি থেকে চাবি এনে দরজা খুলে ঘরের ভেতর ঢুকবার উৎসাহ নেই শেফালির। এটাচিকেস হাতে করে শেফালি বারান্দা থেকেই ফিরে যায়। আর নয়। চিরকালের জন্য এখানকার সম্বন্ধ চুকে গেছে।

কিন্তু কোথায়, কার কাছে যাবে সে? আমবাগানের পথ দিয়ে এগোতে এগোতে শেফালি ভাবে।

মাথার উপর আমগাছের ডালে পাতার আড়ালে বসে কোকিল ডেকে উঠে, কু-হু-উ। কু-হু-উ। শেফালি উপরে তাকিয়ে থমকে দাঁড়ায়। কোকিল কেঁদেই চলেছে, কু-হু-উ কু-হু-উ! কি ব্যথা ভরা সে কণ্ঠ! শেফালি আর নিজেকে সামলাতে পারে না। সেখানেই বসে পড়ে দুহাতে মুখ ঢেকে উচ্ছসিত কান্নায় আকুল হয়ে উঠে। ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদে শেফালি।

শেফালি! পেছন থেকে শ্যামল তার কাঁধে হাত রাখে। আবেগ ভরা স্বরে বলে, আমি এসেছে শেফালি। আমি শ্যামলদা। মুখ তুলে তাকাও।

আস্তে আস্তে অশ্রুসিক্ত মুখ তুলে শ্যামল সেদিকে তাকায়। শ্যামল চমকে উঠে। বলে, একি চেহারা হয়েছে তোর বোন! দেখে যে চেনাই যায় না। ওঠো! আমার হাত ধরে উঠে দাঁড়াও।

শ্যামল তার হাত ধরে টেনে তুললে। তারপর শেফালির এটাচিকেস নিজের হাতে নিয়ে বললে, আমি তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি শেফালি।

কোথায়? শেফালি বোকার মত প্রশ্ন করে।

শ্যামল বললে, জিজ্ঞেস করতে নেই। শ্যামলদা যা বলবে, করবে। বৌদি তোমার পথ চেয়ে বসে আছে।

বৌদি! শেফালি বললে, বৌদি আমাকে নিয়ে যেতে বলেছেন?

হ্যাঁ, শ্যামল বললে। কুঞ্জদাদু আর বেঁচে নেই, কিন্তু আমি ত বেঁচে আছি, শেফালি। আজ থেকে তোমার সব দায়িত্ব আমি নিলাম।

দাদু! কুঞ্জদাদুর নাম শুনে শেফালি আবার কাঁদতে লাগল।

শ্যামল তার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বললে, ছি আর কাঁদে না। রাস্তায় গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। আমার সঙ্গে এস।

তারা এগিয়ে চললো।

চৌদ্দ

সেদিনের ঘটনার পর থেকে শারীরিক অসুস্থতার দোহাই পেড়ে উজ্জলা ঘরকন্না ক্লাবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা কমিয়ে দিয়েছিল। উজ্জলা এদের দলে মিশত অবশ্য, কিন্তু সে ত বরাবরই জানত মিসেস রায় প্রভৃতিদের সমগোত্র সে নয়। অন্তর্দ্বন্দ্ব তার বরাবরই ছিল, কিন্তু সেদিন শ্যামলের ভর্ৎসনায়

পর থেকে সে দ্বন্দ্ব প্রবল হয়ে উঠল। সত্যিই ত সে ভুল পথে চলেছে। বিপ্লবীর একি পরিণতি! নিজের জীবন দিয়ে দেশকে জাগাবার ভার যে নিয়েছিল, সে এখন প্রজাপতিপনা করে ঘুরে বেড়াবে? কিন্তু এরজন্য শ্যামলও কিছু কম দায়ী নয়!

কদিন উজ্জ্বলা বাড়ী থেকে বার হয়নি। এদিকে শেফালিও অসুস্থ। কলকাতায় আসার পর থেকে মেয়েটার অসুখ বিসুখ লেগেই আছে। সর্দ্দি, কাশী, জ্বর। আজ অপেক্ষাকৃত একটু ভাল সে।

কিন্তু ভাল হলেই বা কি, মেয়েটা কেমন যেন হয়ে গেছে। কোনদিকেই তার লক্ষ্য নেই। কতখানি আঘাত পেলে মানুষ এমন হয়, উজ্জ্বলার জানতে বাকী নেই। উজ্জ্বলার দুঃখ এজন্য যে, শেফালি তার কাছেও মন খুলে সব কথা বলতে চায় না।

বিকালবেলা। উজ্জ্বলার মুহূর্ত্তগুলো ভারী হয়ে উঠেছে। বাইরে কোথাও যাবার মত উৎসাহ তার নেই। সময় কাটাবার জন্য অনেকদিন পর আজ আবার উজ্জ্বলা পিয়ানোয় এসে বসল।

শ্যামল এল। উজ্জ্বলা পিয়ানো বন্ধ করে ঘুরে শ্যামলের দিকে তাকিয়ে বললে, শেফালির ওষুধ এনেছ?

শ্যামল মাথা নাড়ল, হ্যাঁ। তারপর ওষুধের শিশিটা একখানি টিপয়ে রেখে দিয়ে বললে, উজ্জ্বলা তুমি যে এত সুন্দর বাজাতে পার আমি জানতাম না। কেন যে দুর্ভাগাদলের সঙ্গে এসে জুটেছিলে আমি তাই ভাবি। আই.সি.এস. গিন্নী হলেই তোমাকে মানাত ভাল।

তামাসা করছ? বললে উজ্জ্বলা।

তামাসা আমি কখনো করি? শ্যামল বললে।

উজ্জ্বলা উঠে দাঁড়াল। বললে, আমাকে বিয়ে করে তুমি সুখী হওনি একথা মনে করিয়ে দিচ্ছ?

শ্যামল এবার গভীর স্বরে বললে, উজ্জ্বলা সুখী আমি যদি না হয়ে থাকি,

সে দোষ আমার নিজের। সুখী হওয়ার যোগ্যতা আমার নেই। আর সেই কারণেই তোমাকেও সুখী করতে পারিনি। কিন্তু এসব কথা থাক উজ্জ্বলা। শেফালি কোথায়?

বারান্দায় ডেকচেয়ারে বসে আছে।

শ্যামল বললে, জান উজ্জ্বলা ডাক্তার কি বললেন? ডাক্তার বললেন ওর মানসিক প্রফুল্লতা ফিরে না এলে অসুখ বিসুখও সারবে না।

বেচারা! উজ্জ্বলা সহানুভূতি ভরা গলায় বললে, বড্ড shock পেয়েছে। দিনের দিন যেমন দুর্বল হয়ে পড়ছে ও,—আমার ভয় হয় পাছে এর থেকে না কোন কঠিন রোগ দেখা দেয়।

শ্যামল বললে, আমার ও সেই ভয়।

আর তা-ও বলি, উজ্জ্বলা বললে, না খেলে শরীরে রক্ত হবে কিসে। রোজ রোজ দুবেলা খাওয়ার জন্য কত আর জোর জবরদস্তি করা যায়!

কিন্তু এ দায়িত্ব যে আমরা মাথা পেতে নিয়েছি উজ্জ্বলা! শ্যামল বললে। তারপর উঠে জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়াল। বললে, কুঞ্জদাদু আমার আত্মীয় ছিলেন না, কিন্তু আত্মীয়েরও বেশী ছিলেন,—তুমি ত সবই জান।

উজ্জ্বলা নীরবে মাথা নাড়ল, হ্যাঁ সবই সে জানে।

শ্যামল আর কিছু বললে না, ভেতরে গেল। উজ্জ্বলা আবার পিয়ানো বাজাতে লাগল।

সহসা সামনের খোলা দরজায় দৃষ্টি পড়তেই উজ্জ্বলার আঙুলগুলো আপনা থেকে থেমে গেল।

পর্দ্দার ফাঁকে একখানি মুখ ঘরের ভেতর উঁকি ঝুকি মারছে। লোকটার মুখের প্রায় সবটুকুই গোঁফ দাড়িতে ঢাকা। মাথায় শিখদের মত করে পাগড়ী বাঁধা। কিন্তু শিখ সে নয়, উজ্জ্বলা প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝতে পেরেছিল।

উজ্জ্বলা পিয়ানোর টুল থেকে উঠে দাঁড়াল। তারপর সামনের দরজার দিকে কয়েক পা এগিয়ে এসে বললে; কিস্‌কো মাংগতা?

আগন্তুক তার দিকে এমন করে তাকাল, যেন উজ্জ্বলা তার বহু পরিচিত।

কেয়া মতলব? উজ্জ্বলা বিরক্তস্বরে বললে।

উজ্জ্বলা!

আগন্তুকের মুখে নিজের নাম শুনে উজ্জ্বলা বিস্মিত হল। কিন্তু তখনো সে সুশীকে চিনতে পারেনি। পর্দ্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকে সুশী গোঁফ দাড়ির একদিক খুলতেই উজ্জ্বলা খুশীতে চেঁচিয়ে উঠল, সুশী!

সুশী ঠোঁটে আঙ্গুল দিয়ে বললে, আস্তে।

গভীর স্নেহসিক্ত দৃষ্টি দিয়ে উজ্জ্বলা একমুহূর্ত্ত সুশীকে দেখতে লাগল। তার পায়ে ছেঁড়া পাম্পস্‌। পরনের পা জামাটাতে দু'তিন যায়গায় তালি দেওয়া। গায়ের সার্টটা পা জামার চেয়েও নোংরা! কতদিন পরে সে সুশীকে দেখল!

সুশী ঘরখানির চারপাশে বারেক চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললে; বেশত গুছিয়ে বসেছ দেখছি! একেবারে বিপ্লবী থেকে বুর্জ্জোয়া।

উজ্জ্বলা বললে, দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বস।

সুশী নিজের জামা কাপড়ের দিকে বারেক তাকিয়ে বললে; এই নোংরা জামা কাপড় নিয়ে এখানে বসতে ভরসা পাচ্ছি নে, উজ্জ্বলা। তা তুমি যখন Permission দিচ্ছ—

সুশী একখানি কাউচে বসে পড়ল। বললে; যাই বল না কেন উজ্জ্বলা দড়ির খাটিয়াগুলো ঢের বেশী comfortable ছিল। সেই সব দড়ির খাটিয়ায় শুয়ে বসে আমরা কি সুখেই না দিন কাটাতুম!

উজ্জ্বলা হেসে বললে, খাটিয়াগুলো তোলা আছে। এক্ষুণি আনিয়ে দিচ্ছি।

সুশী হেসে বললে, এখানে দড়ির খাটিয়া আর মানাবে না উজ্জ্বলা। জানো,

এই দড়ির খাটিয়ায় শুয়ে বৈকুণ্ঠের হাতের চা অমৃতের মত লাগত তখন। বৈকুণ্ঠ, বৈকুণ্ঠ আছে নাকি আজো?

উজ্জলা সুশীর সামনে একখানি চেয়ারে বসে বললে, যাবে আর কোন চুলোয়। এখানেই আছে। কিন্তু সুশী তোমার এসরাজটা সঙ্গে আনলে না কেন? কতকাল এসরাজ শুনিনি।

সুশীর কণ্ঠে আবার বিদ্রূপ। বললে, আমার এসরাজ তোমার সংসারে বেমানান ঠেকবে উজ্জলা। যাক সে কথা। অনেকদিন পরে তোমাকে দেখে সত্যিই আমি খুসী হয়েছি। শ্যামল বাড়ী নেই?

শ্যামল এ ঘরেই আসছিল। দরজা থেকে সুশীকে দেখে ছুটে এল শ্যামল। বুকে জড়িয়ে ধরল তাকে। বললে, এবার আর তোকে ছাড়ছি নে সুশী।

শ্যামলের অলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করে সুশী বললে, আমি absconder বিপদের আশঙ্কা সত্ত্বেও তোদেব একবার সঙ্গে দেখা না করে যেতে পারলাম না। কিন্তু আর বেশীক্ষণ এখানে থাকা উচিত হবে না বোধহয়।

শ্যামল আবেগভরা স্বরে বললে, কিন্তু তোর সঙ্গে যে কোন কথাই হলনা। সুশী স্মিতমুখে বললে, শুনেছি তুই নাকি অহিংসবাদী হয়েছিস, আমার সঙ্গে তোর আর কি কথা থাকতে পারে?

হিংসা অহিংসা—শ্যামল বললে, পথ যাই হোক না কেন লক্ষ্যস্থল সবারই এক। কিন্তু সুশী তোর সঙ্গে সত্যিই আমার অনেক গোপনীয় কথা আছে ভাই।

সুশী দাড়িটা বাধতে বাধতে বললে; তাড়াতাড়ি বল। আমার সময় নেই।

এখানে? শ্যামল বললে; না না এখানে সে সব কথা আলোচনা করা অসম্ভব। চল্। আমরা বাইরে কোথাও যাই।

সুশী বললে, তাই চল। তারপর উজ্জ্বলার দিকে ফিরে বললে, আসি উজ্জ্বলা।

সুশী ও শ্যামল বেরিয়ে গেল। এক মুহূর্ত্ত কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল উজ্জ্বলা। মিসেস রায়ের সোসাইটীতে মেলামেশা করবার অপরাধে শ্যামল তাকে কতখানি ঘৃণা করে আজ প্রথম উজ্জ্বলা উপলব্ধি করল। সুশী ত শুধু শ্যামলের বন্ধু না—উজ্জ্বলারও বন্ধু সে। শ্যামল তাকে এমনভাবে অপমান করতে পারে, উজ্জ্বলার ধারণারও অতীত। পার্টির সংস্রব ত্যাগ করেছে বলে, শ্যামলের চোখে সে কি এমনি পতিত হয়ে উঠল?

পায়ের শব্দে উজ্জ্বলা ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। শেফালি। উজ্জ্বলা বললে; বস শেফালি। ওষুধ খেয়েছিলে ত?

শেফালি মাথা নাড়ল, হ্যাঁ। বললে; কাঁদছিলে কেন বৌদি? উজ্জ্বলা বললে, দূর পাগলি কাঁদব কেন। চোখে কি পড়েছে।

শেফালি উজ্জ্বলার কথা বিশ্বাস করল না, বললে, শ্যামলদা কোথায় বৌদি?

এইমাত্র বেরিয়ে গেলেন, উজ্জ্বলা বললে। আচ্ছা শেফালি,—উজ্জ্বলা একটু ভেবে বললে, তোমার দাদাকে যদি আবার জেলে ধরে নিয়ে যায়, তুমি খুব কাঁদবে,—না?

শেফালি বললে, ওঁর পক্ষে জেলের বাইরে থাকাটাই ত অস্বাভাবিক ঘটনা বৌদি। জেলই ওঁর স্থান।

শেফালির কথায় উজ্জ্বলা চমকে উঠল। শেফালি সত্যি কথাই বলছে। শ্যামল যে এই ক'মাস বাইরে আছে, এটাই ত একটা বিস্ময়কর ব্যাপার!

উজ্জ্বলা সায় দিয়ে বললে; সে কথা ঠিক। উনি জেলে গেলে সত্যাগ্রহ করে তুমিও আবার জেলে যাবে বুঝি?

শেফালি উত্তর দিল না। এ কথার কি উত্তর আছে? উজ্জ্বলা আপন মনেই বলতে লাগল; তা বেশ। তোমরা চলে গেলে আমি খুব মজা করে খাব দাব আর ঘুরে বেড়াব।

শেফালি বললে, কেন তুমি একথা বলছ বৌদি! তুমিও ত পার্টিতে এক সঙ্গে কাজ করতে। তুমিও অন্তরীণ বন্দী ছিলে।

ছিলাম,—কিন্তু এখন আর নেই। উজ্জ্বলা উঠে দাঁড়াল। বললে, যাকগে ওসব কথা। আমি একটু বেরোচ্ছি। তোমার দাদা যদি খোঁজখবর করেন,—বলো ফিরতে আমার দেরী হবে।

শেফালি মাথা নাড়ল।

ড্রেসিংরুমে ঢুকে উজ্জ্বলা এক মুহূর্ত্ত আয়নায় তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। হারাণোদিনের স্মৃতি তার মনের চোখে ভেসে উঠে।...

শ্যামপুকুরে, পোড়োবাড়ীর প্রায়ান্ধকার ঘরে বসে তারা কম্পোজ করছে। সে, হীরু, সুশী, সাধন। শ্যামল কোণে বসে কপি লিখছে! বন্দী হওয়ার আগে প্রেসটা সে হীরুর দায়িত্বে রেখেছিল। প্রেসটা কি পুলিশ বাজেয়াপ্ত করেছে? হীরুই বা কোথায় গেল, কে জানে? সাধন ত জেলে। সুশী পলাতক। কিন্তু হীরুর কোন খোজখবর কেউ জানে না। বিয়ের পর কলকাতায় ফিরে এসে উজ্জ্বলা হীরুর খোঁজ করেনি, ভেবে আজ তার খুব অশ্চার্য্য লাগে।

অন্তরীণ বন্দী হওয়ার আগে উজ্জ্বলা, পার্টির কাজে দমদমে হীরুর বাড়ীতে একাধিকবার গেছে। কিন্তু এতদিন একবারটীও হীরুর বাড়ী যাওয়ায় কথা উজ্জ্বলার মনে পড়ল না, এমনি মানুষের মন!

হ্যাঁ, আজ সে হীরুর বাড়ীতেই যাবে। হীরু যদি বাইরে থাকে, হীরুর সঙ্গে যদি তার দেখা হয়, পার্টির অনেক খবরই সে পাবে।

আজ আর প্রসাধন করতে উজ্জ্বলার ভাল লাগে না। আটপৌরে শাড়ী পরেই সে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে।

সন্ধ্যার আর বেশী বাকী নেই। রাস্তায় আলোগুলো ইতিমধ্যে জ্বলে

উঠেছে। ফুটপাথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে হীরুর খোঁজে দমদমে যাবার উৎসাহ উজ্জ্বলার কমে আসে। এ সময়ে দমদমে যেয়ে বাড়ী খুঁজে বার করা খুবই শক্ত।

হ্যালো মিসেস বোস। উজ্জ্বলা ফিরে তাকাল। মিসেস রায় এগিয়ে এসে উজ্জ্বলার কাঁধ স্পর্শ করে বললে, You are a darling. এই আবছা অন্ধকারেও দূর থেকে দেখে আপনাকে ঠিক চিনে ফেলেছি।

উজ্জ্বলা বললে, সেজন্য complement ত আপনার প্রাপ্য মিসেস রায়।

মিসেস রায় বললে, ঘবকন্না ক্লাব আপনার অভাবে ডুবুডুবু হয়ে এসেছে! আজকাল কেউ আর ওখানে যেতে উৎসাহ বোধ করে না।

উজ্জ্বলা হেসে বললে, এমন কি আপনি ও?

মিসেস রায় বললে, আপনি আসবেন না, ওখানে যেয়ে আমি কি করব?

তারপর মিষ্টি করে হেসে বললে, সত্যি বলছি মিসেস বোস, আপনি যদি পুরুষ হতেন নিশ্চয়ই আপনাকে elope করতুম।

ধন্যবাদ মিসেস রায়। উজ্জ্বলা সংক্ষিপ্ত করে বললে।

মিসেস রায়ের রসিকতাগুলো আজ সে উপভোগ করতে পারছিল না।

তারপর যাচ্ছেন কোথায়? মিসেস রায় বললে, প্রদর্শনীতে বুঝি?

প্রদর্শনী? উজ্জ্বলা বললে, কোথায় সেটা? কই জানিনে ত কিছু!

মিসেস রায় বললে, এইত সামনে, গলির ভেতর পার্কটিতে খাদী প্রদর্শনী হচ্ছে। খুব ফাইন খাদী নাকি প্রদর্শনীতে এসেছে! তা ছাড়া ভাল ভাল খাদী সিল্কের থান ও আছে। তাই একবার ঢুঁ মারতে চলেছি। আপনিও চলুন না মিসেস বোস।

উজ্জ্বলা বারেক ইতস্তত করে বললে, তাই চলুন।

যেতে যেতে মিসেস রায় বলতে লাগল; মিসেস দত্ত বলেন, খাদী যদি পরতেই হয় মোটা খাদীই পরা উচিত। যাতে লোকে দূরে থেকে দেখে

খাদী বলে বুঝতে পারে। ফাইন খাদী কাছে থেকেই ধরা যায় না, ত পাবলিসিটী হবে কেমন করে!

উজ্জ্বলা বললে; সে ত বটেই। পাবলিসিটাই যদি না হল ত কষ্ট করে খাদী পরে কি লাভ?

বিদ্রূপটা মিসেস রায় ধরতে পারে না। বললে, তা ত জানি! কিন্তু ভাই মোটা খাদী আমি গায়ে রাখতে পারিনে। দু একবার চেষ্টা করে দেখেছি। কিন্তু যা ওজন!

প্রদর্শনী মণ্ডপে ঢুকে উজ্জ্বলা খুসীই হল। শুধু খাদীই নয়, খাদীর সঙ্গে অন্যান্য নানা কুটীর শিল্পের প্রদর্শনীব্যবস্থা করা হয়েছে। দুপাশে স্টলের সারি। মাঝখানে ছোট একটি ডায়াস,—বক্তৃতামঞ্চ। মণ্ডপে লোকজন বেশী ছিল না। মিসেস রায় ও উজ্জ্বলা ঘুরে ঘুরে স্টলগুলো দেখছিল। উজ্জ্বলা বললে, প্রদর্শনীতে আরো লোকজন হওয়া উচিত ছিল কিন্তু।

মিসেস রায় বললে, সবাই ত আর আমাদের মত সাহসী না মিসেস বোস। খাদী প্রদর্শনীতে এসে শেষকালে সরকার বাহাদুরের সুনজরে পড়ুক আর কি!

একটা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে তারা খাদী সিল্কের থান গুলো দেখছিল। মাথার উপর লাউডস্পীকার সহসা চীৎকার করে উঠতেই তারা মুখ তুলে তাকাল।

লাউড স্পীকার বলতে লাগল, ত্রিশ কোটী বুভুক্ষুর দিকে ফিরে তাকান। ইংরাজের শোষণ নীতির ফলে সোনারদেশ ভারত আজ দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর লীলাভূমি। ঘরে ঘরে লোক না খেতে পেয়ে মরছে। ব্রিটিশ পণ্য বর্জন করে ইংরাজকে এদেশ থেকে তাড়ান। Boycot British goods. Boycot.

কন্তু লাউড স্পীকারের বক্তৃতা শেষ হবার আগেই 'পুলিশ' 'পুলিশ' রব

উঠল। দর্শকেরা ইতস্তত ছুটতে লাগল। উজ্জ্বলা ও মিসেস রায় এক মুহূর্ত হকচকিয়ে গেল। তাদের চোখের সামনেই একদল লাঠিধারী পুলিশ ছুটে এসে প্রদর্শনীর স্টলগুলো ভাঙতে সুরু করল। কয়েকজন পুলিশ দোকানে ঢুকে খাদীর থানগুলো ছুড়ে রাস্তায় ফেলতে লাগল।

রাস্তায়, ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে এসে মিসেস রায় হাঁফ ছাড়ল। বললে, বাবা! খুব বেঁচে গেছি। এসব স্বদেশী ঝামেলায় যাওয়াটাই অন্যায়।

চোখের উপর এতবড় অত্যাচার অনুষ্ঠিত হতে দেখে উজ্জ্বলা স্তব্ধ হয়ে গেছল! বললে, বিলিতি কাপড় পরবনা এ কথাটা বলাও রাজদ্রোহ!

মিসেস রায় কাঁধ ঝাকুনি দিয়ে বললে, After all sedition is sedition.

উজ্জ্বলা রেগে বললে, দীর্ঘকাল ইংরেজের দাসত্ব করে আমরা যে কতখানি মনুষ্যত্বহীন হয়ে পড়েছি আপনার কথাই তার প্রমাণ।

উজ্জ্বলার কথার ঝাঁঝে মিসেস রায় বিস্মিত হল। বললে, কিন্তু অত বড় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে আমরা কি করতে পারি, মিসেস বোস?

উজ্জ্বলা উত্তর দিল না। মিসেস রায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে একখানি দমদম গামী বাসে চেপে বসল।

আধ ভেজানো দরজা দিয়ে ঘরের ভেতর থেকে কেরাসিন ল্যাম্পের মিটমিটে আলো আসছিল। উজ্জ্বলা থমকে দাঁড়াল। সন্ধ্যার অন্ধকারে বাড়ীটা ভুল হয়নি ত?

কে, কে, ওখানে? ভেতর থেকে স্ত্রীকণ্ঠের সাড়া এল! এ স্বর উজ্জ্বলার পরিচিত। হীরুর মার গলা। উজ্জ্বলা ঘরে ঢুকে বললে, আমি উজ্জ্বলা। চিনতে পারছ না পিসীমা?

ল্যাম্পটা মুখের কাছে তুলে ধরে বারেক উজ্জ্বলাকে দেখে নিয়ে হীরুর মা বললে, ও তুমি।

তারপর সহসা দুহাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গেই পাশের ঘরে কে একজন কাশতে সুরু করল। হীরুর মা আঙুল দিয়ে ঘরের দরজাটা দেখিয়ে দিয়ে বললে, হীরুর যক্ষ্মা হয়েছে। উজ্জ্বলা চমকে উঠল।

চারপায়ার উপর ছেঁড়া কাঁথার বিছানায় শুয়ে হীরু। উজ্জ্বলাকে দেখে আনন্দের আতিশয্যে, কি বলতে গিয়ে হীরু আর একবার কাশতে সুরু করল। রোগ শীর্ণ পাণ্ডুর তার মুখ।

কাশী থামলে হীরু বললে, শেষ পর্য্যন্ত প্রেসটাকে বাঁচাতে পারিনি উজ্জ্বলাদি। ভাগ্যিস সেদিন আমরা কেউ ছিলাম না। তা না হলে আজ আমাকে এখানে দেখতে পেতে না।

উজ্জ্বলা চারপায়ার পাশে একখানি ভাঙ্গা চেয়ারে বসে পড়ে বল,ল, কিন্তু হীরু তুমি অসুস্থ, শুয়ে পড়াই ভাল!

ও কিছু না, ঠিক আছে হীরু, বললে; জান উজ্জ্বলাদি, সুশীদা ছদ্ম:বেশে আজ সকালবেলা এখানে এসেছিল। ওর নামে তিন তিনটে ওয়ারেণ্ট। ধরা পড়লেই ফাঁসী। কিন্তু সুশীদা বেপরোয়া। বললে, দু'একদিনের মধ্যে বার্ম্মায় পাড়ি দিচ্ছে। যাক সে কথা। অন্তরীণ শিবির থেকে তুমি কবে মুক্তি পেলে উজ্জ্বলাদি? শ্যামলদারই বা কি খবর?

উজ্জ্বলার বুঝতে বাকী রইল না হীরু ও দলের অন্যান্য যারা বাইরে আছে, উজ্জ্বলা ও শ্যামলের সম্বন্ধে কোন খবরই তারা রাখে না। কী করেই বা খবর রাখবে! শুধু উজ্জ্বলাই নয়, শ্যামল ও এদের সংস্রব অনেক কাল ছেড়ে দিয়েছে।

হীরুর কথার উত্তর দিতে গিয়ে উজ্জ্বলা বেশ একটু লজ্জিত হল, বললে, ছুটী ত পেয়েছি বেশ কিছুদিন আজ। তারপর হেসে বললে; এই ক'মাস ঘরকন্না করলাম।

হীরু খুসীরস্বরে বললে, তবে কি শ্যামলদা—? কথাটা সে শেষ করল না। উজ্জ্বলা মাথা নাড়ল; হ্যাঁ।

হীরুকে কিছু বলার অবসর না দিয়েই সে বলতে লাগল, কিন্তু ঘরে আর মন টি`কছে না। বিপ্লবের রক্তরাঙা পথ আমায় আবার হাতছানি দিয়ে ডাকছে। তাই তোমাদের কাছে ছুটে এলাম।

হীরু চুপ করে বসে রইল।

মনে আছে তোমার হীরু? উজ্জ্বলা বলতে লাগল, একদিন তুমি আমার কাছে কাজ চেয়েছিলে। আজ কিন্তু আমি তোমার কাছে কাজ চাইতে এসেছি।

হীরু বললে, তুমি ফিরে এসেছ, এর চেয়ে আর খুসীর কথা কি আছে উজ্জ্বলাদি। একটু বসো। এক্ষুনি সুরেশদার আসবার কথা আছে।

সুরেশদা! উজ্জ্বলা বললে, সুরেশদা তা হলে এখনো বেঁচে আছেন?

আছেন বই কি উজ্জ্বলাদি। হীরু বললে, কাগজে তাঁর মৃত্যু সংবাদ বেরিয়েছিল, কিন্তু সেটা সাজানো খবর। সুরেশদা বেঁচে আছেন, পুলিশ বিভাগের একটিমাত্র লোক সে কথা জানে। কিন্তু তার কথা প্রমাণ করবার মত আজো সে কিছু যোগাড় করতে পারেনি।

গলার স্বর নামিয়ে হীরু বললে, ঐ লোকটা বেঁচে থাকলে সুরেশদার জীবন বিপন্ন। তাই লোকটাকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে সরাবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

এক নিঃশ্বাসে এতগুলো কথা বলে, হীরু আবার কাশতে সুরু করল। সে কী কাশী! কিছুতেই থামতে চায় না।

কাশী থামলে উজ্জ্বলা বললে, ডাক্তার দেখিয়েছিলে?

হীরু বললে, ডাক্তারের কথা ছেড়ে দাও। ডাক্তার অমন অনেক কিছুই বলে। উজ্জ্বলা বললে, হীরু, কিছুদিনের জন্য তুমি পুরী কিম্বা অন্য কোথাও চলে যাও।...টাকার কথা ভাবছ? তুমি ত জানই হীরু, তোমাকে চেঞ্জে পাঠাবার খরচ দিতে আমার কিছু অসুবিধে হবে না।

সে হয় না উজ্জ্বলাদি, হীরু বললে, চেঞ্জে যাবার আমার উপায় নেই। এখানে আমার অনেক কাজ অসমাপ্ত পড়ে আছে।

উজ্জ্বলা বললে, কাজ? এ শরীর নিয়ে কী কাজ তুমি করবে ভাই?

হীরু হাসতে লাগল। বললে, যতটুকু করতে পারি তাই করি। তাই করব উজ্জ্বলাদি।

এক মুহূর্ত্ত কি ভেবে উজ্জ্বলা বললে, তোমার অসমাপ্ত কাজের ভার যদি আমি গ্রহণ করি, তবু তোমার চেঞ্জে যেতে আপত্তি আছে?

হীরু ইতস্তত করতে লাগল। উজ্জ্বলা বললে, সুরেশদাকে আমি নিজে বলব'খন, কিচ্ছু তোমাকে বলতে হবে না।

হীরু বললে, কিন্তু সে কাজ কি তুমি পারবে উজ্জ্বলাদি?

উজ্জ্বলা হাসল। বললে, তুমি নিশ্চিন্ত থাক হীরু।

...দলের সঙ্গে উজ্জ্বলার যোগাযোগ সেদিন থেকে আবার ঘনিষ্ট হয়ে উঠল।

উজ্জ্বলা যখন বাড়ী ফিরে এল, শ্যামল তখনো ফেরেনি। উজ্জ্বলার ক্ষিধে ছিল না। আলো নিভিয়ে সে শুয়ে পড়ল। শ্যামল কখন বাড়ী ফিরেছে, সে জানতেও পারেনি।

ভোরবেলা তখনো অন্ধকার কাটেনি। বৈকুণ্ঠর ডাকাডাকিতে উজ্জ্বলার ঘুম ভাঙ্গল।

বৌদি বৌদি! বৈকুণ্ঠ ডাকতে লাগল, শীগগির উঠুন। পুলিশ বাড়ী ঘেরাও করেছে।

পুলিশ! উজ্জ্বলা উঠে বসল বিছানায়। শ্যামলকে সে ঠেলে তুললে। বললে, পুলিশ! কাগজপত্র যদি কিছু নষ্ট করবার থাকে ত শীগগির।

বাইরের দরজায় পুলিশ তখন লাথি মারতে সুরু করেছে। শ্যামল মুখ ধুবার জন্য ওয়াশ বেসিনের দিকে যেতে যেতে বললে, বাইরের দরজাটা খুলে দাও বৈকুণ্ঠ!

আমিই খুলে দিচ্ছি, উজ্জ্বলা বললে। তারপর বইয়ের দিকে সে দ্রুত যেতে লাগাল।

দরজার সামনে দুজন পুলিশ অফিসার দাঁড়িয়েছিল। উজ্জ্বলা ধমক দিয়ে বললে, কলিং বেল বাজাতে শেখেননি ?

উজ্জ্বলার সে মূর্ত্তির দিকে তাকিয়ে পুলিশ অফিসারেরা পরস্পরের দিকে তাকাল।

Sorry মাদাম, প্রথম পুলিশ অফিসার বললে। অসময়ে আপনার ঘুম ভাঙ্গালুম বলে দুঃখিত। শ্যামলবাবু বাড়ী আছেন ?

শ্যামল ভেতরের দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকছিল। বললে, এই যে আমি। আদেশ করুন।

আপনার বাড়ী সার্চ্চ করা হবে, দ্বিতীয় পুলিশ অফিসার বললে।

শ্যামল বললে, করুন।

একঘণ্টা ধরে সারা বাড়ী তন্ন তন্ন করে খুঁজে কিছু না পেয়ে শ্যামলের একখানি অর্দ্ধ সমাপ্ত পাণ্ডুলিপি তারা হস্তগত করল। তারপর বসবার ঘরে ফিরে এসে শ্যামলকে জেরা করতে সুরু করল।—

আপনার ভূতপূর্ব্ব সহকর্ম্মী সুশীতল ধর ছদ্মবেশে কাল বেলা পাঁচটার সময় এ বাড়ীতে এসে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। আপনি কি একথা অস্বীকার করেন ?

—সুতরাং রাত্রে তিনি এখানেই ছিলেন।

—আপনি নিশ্চয়ই তার ঠিকানা জানেন।

শ্যামল বললে ; আপনারা কি বলছেন, আমি ঠিক বুঝতে পারছি নে। কাল বিকাল থেকে এ-যাবৎ এ-বাড়ীতে কেউ আসেনি।

প্রথম পুলিশ অফিসার বললে ; তা'লে আপনি কিছুই স্বীকার করবেন না ? দেখছি সুশীবাবুর আগে আপনারাই একটা বন্দোবস্ত করতে হয়।

আপনাদের দয়া। শ্যামল বললে; আমার পাণ্ডুলিপিখানি দয়া করে রেখে যান।

—ওতে কিছু clue পাওয়া যায় কি না, আগে আমরা দেখেনি।

তারপর রসিকতা করে বললে; ভয় কি স্যার, আপনার পাণ্ডুলিপি আমরা চুরি করব না! আমরা ত আর সাহিত্যিক নই!

পুলিশপার্টি চলে গেল। শ্যামল ও উজ্জ্বলা একমুহূর্ত্ত বসে রইল। আজকের সার্চ্চ, ডেঞ্জার সিগ্‌ন্যাল ছাড়া কিছু নয়, তারা জানে।

পনর

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর থেকে বাংলার বিপ্লবীরা নতুন উদ্দীপনা পেল। সারা বাংলার বিপ্লবী যুবক যুবতী নিজেদের জীবন দিয়ে চট্টগ্রামের শহীদদের অভিবাদন জানান। ইংরাজসাম্রাজ্যের অনেক ধ্বজাধারী খুঁটী, বিপ্লবীদের পিস্তলের গুলিতে আক্রান্ত ও নিহত হল।

ইংরাজ সরকার অকথ্য, অবর্ণনীয় অত্যাচার করে প্রতিশোধ নিতে লাগল। পুলিশের অত্যাচার ও জুলুমের হাত থেকে এমন কি নিরীহ নাগরিকেরাও রক্ষা পেল না। ব্যাপকভাবে ধর-পাকড় ও খানাতল্লাস সুরু হল।

কলকাতায় ফিরে আসার পর থেকে গেল ক'মাস কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে উজ্জ্বলার যোগাযোগ নেই। তা ছাড়া সে মিসেস রায়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, ঘরকন্না ক্লাবের সভ্যা। উজ্জ্বলার নামে পুলিশ রিপোর্ট ভালই ছিল। রাজনীতিতে উজ্জ্বলার আর কোন আগ্রহ নেই, এমন কি পাঁচুরও ধারণা জন্মেছিল।

মিসেস রায়ের বন্ধু উজ্জ্বলা যে আবার বিপ্লবীদলে যোগ দিতে পারে, সহসা পাঁচু ভাবতেই পারেনি। উজ্জ্বলা পাঁচু ও অন্যান্য গুপ্তপুলিশদের ভোলাবার জন্ত মিসেস রায় ও ঘরকন্না ক্লাবের সঙ্গে আবার মেলামেশা

সুরু করল। এদিকে খুব সতর্ক ভাবে, সে পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলল।

সেদিন খুব ভোরে উঠেই উজ্জলা বেরিয়ে গেছল। ঘন্টা দুই বাদে যখন সে ফিরে এল, শ্যামল বসবার ঘরে খবরের কাগজ হাতে চুপ করে বসেছিল।

উজ্জলাকে দেখে হাই তুলে উদাসস্বরে বললে; কখন তুমি ঘুম থেকে উঠেছ আমি জানতেই পারিনি।

না। উজ্জলা তার সামনে একখানি চেয়ারে বসে পড়ে বললে, আদর্শ স্বামী তুমি কখনো হলে না, এই যা দুঃখ আমার।

কেন একথা বলছ? শ্যামল প্রশ্ন করল।

উজ্জলা বললে; এত ভোরে কোন চুলোয় বেরিয়েছিলাম, আমাকে একবার জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল তোমার।

উজ্জলা সন্ত্রাসবাদী দলে যোগ দিয়েছে, শ্যামল এ-খবর রাখত না। বস্তুত উজ্জলা সম্বন্ধে শ্যামল কোন খবরই রাখত না। উজ্জলাও অভিমান করে এ-সম্বন্ধে শ্যামলকে কিছু বলেনি। কিন্তু আজ, কথাটা শ্যামলকে বলবার জন্য সে প্রস্তুত। শ্যামল তাকে অবহেলা করুক, কিন্তু এখন এই ক'দিন উজ্জলা তাকে দূরে সরে থাকতে দেবে না। নিবিড় করে উজ্জলা তাকে কাছে পেতে চায়। কিন্তু শ্যামলের কথায় উজ্জলার মন আবার শক্ত হয়ে উঠে!

মিসেস রায় ও তোমাদের ঘরকন্না ক্লাবের ব্যাপারে, শ্যামল বললে, আমার কোন উৎসাহ নেই, এত তুমি জানই উজ্জলা।

উজ্জলা শ্যামলের কথার উত্তর না দিয়ে খবরের কাগজখানি সামনে টেনে নিল। এক যায়গায় হেড্‌লাইন তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। শ্যামলবসুর চারখানি বই-ই, সরকার বাজেয়াপ্ত করেছে।

উজ্জলা বললে; তোমার সব ক'খানি বই-ই দেখছি সরকার বাজেয়াপ্ত

করেছে। তারপর একটু থেমে বললে ; কিন্তু এতদিন যে বাজেয়াপ্ত করেনি, এটাই ত আশ্চর্য্য।

আর বোধহয় বাইরে থাকতে পারব না, শ্যামল বললে।

উজ্জ্বলা বললে ; আমি জানি। কিন্তু আমি শেফালির কথাই ভাবছি।

শ্যামল বিস্মিত দৃষ্টিতে উজ্জ্বলার দিকে তাকাল। উজ্জ্বলা কি বলতে চায় !

তুমি ত জানই, উজ্জ্বলা বলতে লাগল, শেফালির হার্ট ভয়ানক দুর্ব্বল। ওষুধ পত্রের চেয়ে নার্সিংএর দরকার ওর ঢের বেশী। ডাক্তার কাল বলছিলেন, এখন থেকে সাবধানে না রাখলে সারাজীবনই ওকে হার্ট-ডিসিজে ভুগতে হবে।

তুমি কি বলতে চাও, শ্যামল বললে, আমি বুঝতে পারিনি উজ্জ্বলা।

আমাদের সংসার অনিশ্চিত। উজ্জ্বলা আস্তে আস্তে বললে ; এ অবস্থায় শেফালিকে কোন নার্সিং হোমে পাঠিয়ে দেওয়াই উচিত।

শ্যামল উঠে দাঁড়ল। ঝাঁঝালো স্বরে বললে ; তার মানে, আমার অনুপস্থিতিতে শেফালির দায়ীত্ব নিতে তুমি অক্ষম, এই কথা ত ?

ঠিক তাই। উজ্জ্বলা ম্লান হেসে বললে।

উজ্জ্বলার কথায় বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে গেল শ্যামল। উজ্জ্বলা কি জানে না, শেফালিকে নিজের বোনের চেয়েও বেশী ভালবাসে শ্যামল ?

ভেবেছিলাম, শ্যামল একমুহূর্ত্ত চুপ করে থেকে বললে ; শেফালিকে তুমিও ভালবাস। তোমার কাছে ওকে রেখে আমি নিশ্চিন্তমনে চলে যেতে পারব। কিন্তু—

শ্যামল কথা শেষ করল না।

উজ্জ্বলা উঠে দাঁড়াল। ম্লান নিষ্প্রভস্বরে বললে, এ দায়িত্ব নিতে আমি অক্ষম। আমায় ক্ষমা কর।

তারপর দ্রুত শোবার ঘরের দিকে যেতে লাগল।

পেছনের বারান্দায়, শেফালি চুপচাপ ডেক চেয়ারে শুয়েছিল। শ্যামল তার পাশে এসে দাঁড়াল। শেফালির দিকে তাকিয়ে মমতায় তার মন ভরে উঠে। উজ্জলার কি মন বলে কিছু নেই? শেফালির রোগ পাণ্ডুর মুখের দিকে যতই সে তাকায়, ততই উজ্জলার উপর অভিমানে মন ভরে আসে।

শ্যামলদা! শেফালি বললে; আমি বাড়ী যাব, শ্যামলদা।

বাড়ী? শ্যামল বললে; হঠাৎ বাড়ী যাওয়ার কথা মনে পড়ল কেন শেফালি? উজ্জলা কিছু বলেছে নাকি?

শেফালি বললে, না না শ্যামলদা, বৌদি কিছু বলেন নি। কতদিন বাড়ী যাইনি। বাড়ী যাবার জন্ত মন কেমন করছে।

শ্যামল বললে, তা যাবি'খন। আগে শরীরটা একটু সারিয়ে নে।

শেফালির কথার অংশ বিশেষ উজ্জলার কাণে গেছল। বিকাল বেলা উজ্জলা শ্যামলকে বললে, শেফালি বুঝি বাড়ী যেতে চাইছে?

শ্যামল বিদ্রূপ করে বললে, কেন ব্যস্ত হচ্ছ উজ্জলা। যে কদিন আমি বাইরে আছি, শেফালি এখানে থাক। তারপর আমি চলে গেলে যেখানে খুসী ওকে পাঠিয়ে দিয়ো।

উজ্জলা আহত হল। কিন্তু কণ্ঠস্বর যথা সম্ভব সংযত রেখে বললে, বলছিলাম কি শেফালিকে নিয়ে দিনকতক বাইরে কোথাও চেঞ্জে যাও না কেন?

তোমার উপদেশ, শ্যামল বললে, বিবেচনা করে দেখব।

কিন্তু এ বিদ্রূপ গায়ে না মেখে উজ্জলা বেহায়ার মত বলতে লাগল, তোমার নিজের শরীরও ত ভাল না। ভেবে দেখ, এতে শেফালির ও শরীর সারবে—তোমার ও স্বাস্থ্য উদ্ধার হবে।

আর তুমি? শ্যামল প্রশ্ন করল।

আমি? উজ্জলা উদাস হয়ে উঠল, আমার জন্ত ব্যস্ত হবার কারণ

নেই কিছু। বন্ধুবান্ধব ক্লাব সোসাইটি সবই ত আমার আছে। তোমরা চলে গেলে আমার কিছু অসুবিধে হবে না।

তা জানি। শ্যামল বললে।

সংক্ষিপ্ত দুটী কথার ভেতর কতখানি অবজ্ঞা ছিল, উজ্জ্বলা তা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করল। কিন্তু এ আঘাত তার পাওনা, উজ্জ্বলা জানত! তাই চোখের জল সম্বরণ করে আস্তে আস্তে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মাঝখানে আর একটা দিন বাকী। কাল ছাব্বিশে জানুয়ারী, স্বাধীনতা দিবস। ইংরাজসরকার স্বাধীনতাদিবসের অনুষ্ঠান বন্ধ করবার জন্ম সর্ব্বত্র একশচৌয়াল্লিশ ধারা জারি করল। কাগজে নোটীশ দিয়ে সরকার জানিয়ে দিল, ঐদিন কোন জাতীয় উৎসবে, এমন কি জাতীয় সঙ্গীতে যারা যোগদান করবে, সরকার তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা করবে। তাদের রাজশত্রু বলে গণ্য করা হবে।

ইস্কুল-কলেজ, পাবলিক এ্যাসোসিয়েশন সর্ব্বত্র সার্কুলার বিলি করা হল, সাবধান, নিশান তুলে রাজদ্রোহ করনা।

অত্যাচারের ভয় দেখিয়ে ইংরাজসরকার স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান বন্ধ করবে? ত্রিশকোটী ভারতবাসীর আশা আকাঙ্খার প্রতীক জাতীয় পতাকা, স্বাধীনতা দিবসে সৈনিকেরা এর জয়গান ঘোষণা করবে না? ইংরাজের বেয়নেটের অনুশাসন মেনে আমরা স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান কলঙ্কিত করব?

সহরের বিভিন্ন মহল্লার কর্ম্মীদের মত এ-পাড়ার কর্ম্মীরাও স্থির করল, স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান তারা বন্ধ করবে না। ভোরে উঠে মিছিল করে পার্কে যেয়ে পতাকা তুলবে তারা।

শ্যামল বললে; পুলিশ আমাদের উপর লাঠি চার্জ্জ করবে—এমন কি 'ফায়ার' ও করতে পারে। এস আমরা প্রতিজ্ঞা করি, যতক্ষণ একজন

কর্মীরও জ্ঞান থাকবে, ছত্রভঙ্গ হয়ে আমরা জাতীয় পতাকার অবমাননা করব না। পার্কে নিশান আমরা তুলবই।

শেষ পর্য্যন্ত স্বাধীনতা দিবসেই উজ্জলার উপর কাজটির ভার পড়ল। উজ্জলা খুসীই হল। ভ্যানিটী ব্যাগে আগ্নেয়াস্ত্রটী নিয়ে উজ্জলা বাড়ী ফিরছিল।

ফুটপাথে দাঁড়িয়ে পাঁচু। শ্যামল কখন বাড়ী থেকে বের হয়, সম্ভবত তাই লক্ষ্য করছিল। উজ্জলা থমকে দাঁড়াল। তার লাল জর্জ্জেট পড়ন্ত রোদের আভায় পাঁচুগোপালের চোখ ঝলসে দিল। কিন্তু উজ্জলা নার্ভাস হয়ে পড়ল। তবে কি পাঁচু তারই জন্য অপেক্ষা করছে? কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই সে নিজেকে সামলে নিয়ে বললে; পাঁচুবাবু যে! অনেকদিন আপনাকে দেখিনি। আজকাল এ-পাড়া ছেড়ে দিয়েছেন নাকি?

পার্কের বেঞ্চে, ফুটপাথে কিম্বা চায়ের দোকানে উজ্জলা পাঁচুকে রোজই দেখে। পাঁচু বললে; আপনি দেখেন না, আমি কিন্তু আপনাকে রোজই দেখি।

তবে কি পাঁচু উজ্জলার সব খবরই রাখে? বিপ্লবীরা মনের ভাব মুখে গোপন রাখতে ওস্তাদ। হেসে বললে, তা দেখা হওয়াটা ত খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু আমি আমার ঘরকন্না ক্লাব নিয়ে এমন ব্যস্ত থাকি—কোনদিকে তাকাবার পর্য্যন্ত সময় হয়ে উঠে না।

স্বল্প হেসে মাথা নেড়ে উজ্জলা কম্পাউণ্ডের ভেতর ঢুকে পড়ল।

বাড়ী খানাতল্লাসী হলে উজ্জলা রিভলবার শুদ্ধ হাতেনাতে ধরা পড়বে। সমস্ত প্ল্যান যাবে ভেস্তে। কিন্তু নিরুপায়।

ড্রেসিংরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে টোটাভরা রিভলবারটী ট্রাঙ্কে তুলে রাখল উজ্জলা। মনে মনে বললে, হে ভগবান! যে কাজের ভার নিয়েছি, তা সম্পন্ন করে যেন ধরা পড়ি!

ষোল

রাত ভোর হতে আর দেরী নেই।

দড়ির খাটিয়ায় শ্যামল পাশ ফিরল। নীচের রাস্তা থেকে মিছিলকারী জনতার জয়ধ্বনি থেকে থেকে ভেসে আসছে। শুধু পদাতিক-ই নয়; জয়োল্লাস উন্মত্ত নাগরিকদের নিয়ে ট্রাকের উপর ট্রাক চলেছে রাজপথে। একটু পরেই তারা দলে দলে পার্কে পার্কে জড় হবে।

কিশোর তরুণ, শিশু বৃদ্ধ, যুবক যুবতী, আজকের নিশানোৎসবে কেউ বাদ যাবে না। স্বাধীন ভারতের প্রথম পতাকা উৎসব আজ!....

সেদিনও ঠিক এমনি উৎসাহ নিয়ে মুষ্টিমেয় কর্ম্মী ছাব্বিশে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবস পালন করতে পথে বেরিয়েছিল।

সে আজ পনের বছর আগেকার কথা।

অত্যাচারী রক্তচক্ষু ইংরেজসরকারের ভয়ে জনতা সেদিন এগিয়ে আসেনি, সাড়া দেয়নি কর্ম্মীদের ডাকে। কর্ম্মীরা একাই চলেছিল সেদিন স্বাধীনতার জয়গান গাইতে।

শ্যামলের জীবনে সেই স্মরণীয় দিন। এরপর এল আগষ্ট বিপ্লব। জন-সমুদ্র জেগে উঠল। সমুদ্র-ঝড়ের মাঝখানে ডিঙ্গি-নৌকোর মত, ব্রিটিশ সরকার থরথর করে কাঁপতে লাগল।...

কিন্তু সেইদিন, পনর বছর আগেকার ঘটনা বহুল সেই দিনটার কথা ভোলা যায় না। বিপ্লবীরও সুখদুঃখ, বেদনাবোধ আছে বুঝি, তা না হলে ব্যথায় শ্যামলের বুক টনটন করে উঠে কেন?

সেদিন খুব ভোরে উঠেই তিনতলায় শেফালির ঘরের জানালায় শ্যামল একখানি জাতীয়-পতাকা লাগিয়ে দিল। অসুস্থ শেফালি বিছানায় উঠে বসল।

শ্যামল স্মিত হেসে বললে ; আজ যে ছাব্বিশে জানুয়ারী, স্বাধীনতা দিবস।

আমার মনে আছে শ্যামলদা। শেফালি বললে।

আস্তে আস্তে সে জানালায় এসে দাঁড়াল। জানালা থেকে পার্কের একাংশ চোখে পড়ে। বেদীর উপর পার্কের স্টেচুটী প্রভাতী আলোয় রাঙা হয়ে উঠেছে।

মিছিল বেরোবে না শ্যামলদা? শেফালি প্রশ্ন করল। পার্কে পতাকা তুলবে না?

হবে রে সবই হবে। শ্যামল বললে।

শেফালি কি ভেবে বললে ; আমিও তোমার সঙ্গে মিছিলে যাব শ্যামলদা!

শ্যামল বললে ; পাগল! এই অসুস্থ শরীর নিয়ে তুই যাবি কোথায়! শেফালি জেদ ধরল, মিছিলে সে যাবেই।

শেফালি! ছোট্ট বোনটী আমার! শ্যামল বললে ; শ্যামলদার কথা শুনতে হয়। লক্ষ্মীমেয়ের মত বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়। আমি এক্ষুণি ফিরে আসব।

কেন আমায় মিছে কথা বলছ! শেফালি অভিমান করে বললে, ফিরে তুমি আসবে না, আমি জানি।

শ্যামল হেসে বললে, শ্যামলদা কখনো মিছে কথা বলে? আজ না হোক কাল, কিম্বা দু'বছর পরে ফিরে আমি আসবই!

সহসা শেফালি নীচু হয়ে শ্যামলের পায়ের ধুলো মাথায় নিল। শ্যামল তাকে তুলে ধরতে গিয়ে বললে, একি! তোর গায়ে জ্বর! যা বিছানায় শুয়ে পড় গে'।

সাধারণত উজ্জ্বলা একটু বেলাতেই চান করে। কিন্তু আজ খুব ভোরে উঠে চান করে সে একখানি সবুজ রংএর সিল্কের শাড়ী পরল। ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে অনেকক্ষণ ধরে সে প্রসাধন করল।

শ্যামল ঘরে ঢুকে একটী পরিচ্ছন্ন জামা গায়ে চড়িয়ে, দ্রুত বেরিয়ে যাচ্ছিল।

উজ্জ্বলা ডাকলে, শোন!

শ্যামল বললে; ব্যাপার কি উজ্জ্বলা—সাজগোজটা যেন আজ একটু বাড়াবাড়ি রকম হচ্ছে?

উজ্জ্বলা বললে: হ্যাঁ, স্বাধীনতা দিবস কিনা আজ।

শ্যামল বললে: মিসেস রায়ের কাছ থেকে বুঝি এ-শিক্ষাটা পেয়েছ যে স্বাধীনতা দিবসে খুব সাজগোজ করতে হয়? তা বেশ। কি বলছিলে বল, আমার সময় নেই।

উজ্জ্বলা শ্যামলের কাছে এসে বসল। বললে, একশ চৌয়াল্লিশ ধারা অমান্য করতে যাচ্ছ? কিন্তু ওরা আজ শোভাযাত্রীদের উপর মেসিনগান চালাবে।

তাই ত শুনেছি। শ্যামল বললে।

না না, উজ্জ্বলা চঞ্চলস্বরে বললে, আমি তোমাকে যেতে দোব না মিছিলে!

—প্রাণের ভয়ে স্বাধীনতার জয়গান গাইব না! তুমি বল কি উজ্জ্বলা? ইংরাজের বেয়নেটের সামনে দাঁড়িয়ে আজ আমরা নিশান তুলবই তুলব। ঘরে বাইরে, পথে ও পার্কে আজ সর্ব্বত্র জাতীয় পতাকা উড়বে।

উজ্জ্বলা এক মুহূর্ত্ত কি ভেবে বললে: তুমি যাও। কিন্তু আর বোধ হয় আমাদের দেখা হবে না।

শ্যামল বললে, মানে? তুমি কি বলতে চাও—হেঁয়ালি রেখে স্পষ্ট করে বল।

আমি আজ চলে যাচ্ছি। উজ্জ্বলা আস্তে আস্তে বলল।

চলে যাচ্ছ? শ্যামল বিমূঢ়স্বরে বললে: কোথায়?

সেকথা তুমি নাই বা জানলে। উজ্জ্বলা বললে : কিন্তু এটুকু জেনো, যেখানে যাচ্ছি সেখান থেকে আর ফিরবার কোন উপায় নেই।

তবে কি,—তবে কি তুমি,—কথাটা শেষ না করেই শ্যামল পার্শ্ববর্ত্তী চেয়ারে ভেঙ্গে পড়ল। এক মুহূর্ত্ত তার মুখে কথা যোগাল না। উজ্জ্বলার কথাবার্ত্তা, চলাফেরা থেকে ক'দিন আগেই জানা উচিত ছিল, সে সন্ত্রাসবাদী দলে যোগ দিয়েছে।

কিন্তু, শ্যামল বলতে লাগল, কিন্তু ওদের দলে যোগ দেবার আগে একবার আমাকে ও ত বলতে পারতে উজ্জ্বলা?

উজ্জ্বলা হাসল। ছুরির ফলার মত তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল হাসি। বললে; ভুলে যেয়োনা বন্ধু, আমাদের terms ছিল equal partnership.

শ্যামল ম্লানস্বরে বললে; দোষ আমারই। ইচ্ছে করেই আমি তোমাকে কিছু বলতাম না। কারণ আমার ধারণা ছিল,—

এসব কথা থাক। উজ্জ্বলা বললে; যা হবার তা ত হয়েই গেছে।

শ্যামল বলতে লাগল; ভুল করে তোমায় দিনের পর দিন, যে আঘাত দিয়েছি, জানি তার ক্ষমা নেই। কিন্তু,—কিন্তু আমার ধারণা ছিল, তুমি আমায় ভালবাস।

উজ্জ্বলা শ্যামলের একখানি হাত নিজের দু'হাতে নিয়ে বললে, সত্যিই তোমাকে ভালবাসি বন্ধু। জন্মান্তর আমি মানি নে, তবু বলতে ইচ্ছে হয় জন্ম জন্মান্তরে যেন তোমাকেই পাই। আমার উপর অবিচার করো না। অভিমান করে সন্ত্রাসবাদী দলে যোগ দিয়ে আমি প্রাণ দিতে যাচ্ছিনে। বিদেশী সরকারের অমানুষিক অত্যাচারে সারাদেশ আজ জর্জ্জরিত আমি সেই বিক্ষুব্ধ জনতারই একজন, প্রতিশোধের জ্বালা বুকে করে ঘর ছেড়ে মরণ পথে পা দিয়েছি।

উজ্জ্বলা কেন শেফালির ভার গ্রহণ করেনি, কেন সে শেফালিকে নার্সিং

হোমে পাঠাতে চেয়েছিল, শ্যামল এখন বুঝতে পারে। এ নিয়ে উজ্জলাকে সে কম আঘাত দেয়নি।

উজ্জলা, শ্যামল বললে; আমি আর দাঁড়াব না। আমি না গেলে এ-মহল্লায় মিছিল বেরোবে না। তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে।

শ্যামল বেরিয়ে গেল।

হাতঘড়ি দেখল উজ্জলা। বাড়ী থেকে বেরোবার এখনো মিনিট দশেক দেরী। অন্যমনস্ক ভাবে সে জানালায় এসে দাঁড়াল।

বাড়ীর সমুখের রাস্তাটা জানালা থেকে যতখানি দেখা যায়, গাড়ীঘোড়া জনমানব শূন্য। পার্ক খালি। মেন্ গেটের সামনে পুলিশ ট্রাকে লাঠিধারী একদল পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে। খানিকটা তফাতে বন্দুকধারী আর একদল পুলিশ। নীচে ফুটপাথে চেয়ারে বসে দুজন সার্জেণ্ট।

উজ্জলা জানালা থেকে ড্রেসিংরুমে ফিরে গেল।

নীচে ছোট একটী মিছিল, গান গেয়ে পার্কের মেন-গেটের দিকে এগিয়ে চলেছে।

> গৃহে গৃহে আজ দীপ মালা জ্বালো।
> নিশান উড়াও হাঁক দিয়ে বল
> মুক্তি চাই মুক্তি চাই
> মুক্তি ভিন্ন লক্ষ্য নাই।

তীব্রস্বরে হুইসেল বেজে উঠতেই লাঠিধারী পুলিশ, ট্রাক থেকে লাফিয়ে নেমে শোভাযাত্রীদের ওপর লাঠি চার্জ্জ করতে লাগল। পুরোভাগে দাঁড়িয়ে শ্যামল সবচেয়ে বেশী মার খেলে।

শোভাযাত্রীদের রক্তে ফুটপাথ ও রাস্তা লাল হয়ে উঠেছে। পরক্ষণেই পুলিশের আর একখানি বড় গাড়ী এসে দাঁড়াল। আহত ও মূর্চ্ছিত শোভাযাত্রীদের টেনে হিঁচড়ে গাড়ীর ভেতর পূরে দিল পুলিশেরা। পরক্ষণেই গাড়ীখানি তাদের নিয়ে চলে গেল।

সহসা দূরে রাস্তার মোড়ে তীব্রস্বরে সাইরেন বেজে উঠতেই পুলিশ অফিসার—লাঠিধারী ও বন্দুকধারী পুলিশ ভর্তি দুখানি ট্রাক নিয়ে ছুটল সেদিকে।

এক মুহূর্ত্ত রাস্তা ও পার্ক খালি।

এই অবসরে একটা ছেলে পার্কের স্টেচুর মাথায় একখানি জাতীয় পতাকা তোলে দিয়ে ছুটে চলে গেল।

পাঁচু চায়ের দোকানে বসেছিল। বেদীর উপর জাতীয় পতাকা দেখে সে ছুটে এল। বেদী থেকে জাতীয় পতাকাখানি খুলে নীচে ছুড়ে ফেলে দিলে পাঁচু।

নিজের ঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে শেফালি দেখছিল। জাতীয় পতাকার এ অবমাননা সে সইতে পারে না। অসুস্থ শরীর নিয়ে রেলিং ধরে দ্রুত নীচে নেমে এল শেফালি। ছুটে রাস্তা পার হয়ে পার্কে ঢুকল সে। তারপর জাতীয় পতাকাখানি মাটি থেকে কুড়িয়ে নিয়ে বেদীর দিকে ছুটতে লাগল।

দেখতে পেয়ে পাঁচু তার বিবর থেকে বেরিয়ে এল।

শেফালি ততক্ষণ বেদীর উপর উঠে গেছে। পাঁচু তার হাত চেপে ধরল। বললে, সাহস ত তোমার কম না খুকী!

জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ছে শেফালির। এতখানি পথ ছুটে এসে ক্লান্তিতে তার হাত পা ভেঙে আসছে। ডাক্তার তাকে সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করতে বারণ করেছিল।

হাত ছাড়ুন? শেফালি বললে।

পাঁচু বীরদর্পে বললে; খুকী তুমি জান না কী তুমি করছ। আজ ছাব্বিশে জানুয়ারী এ-নিশান উড়ানো মানে ব্রিটিশসাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা। এ ছেলেখেলা না খুকী! পুলিশের গাড়ী এদিকে এলে এক্ষুনি তোমাকে গুলি করবে। এখনো সময় আছে, নিশান ফেলে দিয়ে ছুটে পালাও!

শেফালি ঘৃণা ভরে বললে, একথা বলতে তোমার লজ্জা করে না ?

লজ্জা ! পাঁচু বললে ; জান তুমি কার সঙ্গে কথা কইছ ?

জানি। ফেটে পড়ল শেফালি : একটা নির্লজ্জ ভাড়াটে গুণ্ডার সঙ্গে। যার জাত নেই, ধর্মাধর্ম জ্ঞান নেই—এমন কি কোন পরিচয় নেই। নিশান ছাড়, ছাড় নিশান ! ভাল চাওত ছেড়ে দাও, বলছি।

পাঁচু দাঁতে দাঁতে ঘষে বললে ; আস্পর্দ্ধা তোমার কম নয় ত !

শেফালি এবার প্রাণপণ শক্তিতে পাঁচুর হাত ছাড়াবার চেষ্টা করতে লাগল।

নিশান ছাড়, ছাড় বলছি! শেফালি চেঁচাতে লাগল। ক্লান্ত অবসন্ন শেফালি, মুহূর্ত্তের প্রতিটা ভগ্নাংশেই দুর্ব্বলতর হয়ে আসছে। তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। শেষবারের মত প্রাণপণে সে চেঁচিয়ে উঠল : ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও !

পরক্ষণেই স্টেচুর পদতলে বেদীর উপর সে ভেঙ্গে পড়ল। তার মুখ নীচের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। কিন্তু নিশানটা তখনো হাতে।

সহসা পাঁচুর গলা শুকিয়ে গেল। সে ঢোক গিলবার চেষ্টা করল। তার বুঝতে দেরী হল না, শেফালির হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেছে। কপালে হাত দিয়ে সে পরীক্ষা করে দেখল শেফালি মৃত।

বারেক সে পার্কের চারপাশে চোখ বুলিয়ে নিল। না কেউ নেই। একলাফে সে বেদী থেকে নেমে ল্যাম্প পোস্টের আড়ালে এসে বসল।

কিন্তু সে যদি জানত উজ্জ্বলা এতক্ষণ ধরে তাকে লক্ষ্য করছিল !

উজ্জ্বলা ড্রেসিংরুম থেকে কোলাহল শুনতে পেয়েছিল। শোভাযাত্রীদের উপর মারপিটের সময় সর্ব্বত্রই একই ধরণের কোলাহল উঠে। টোটা ভর্ত্তি রিভলবারটা ভ্যানিটি ব্যাগে পুরে উজ্জ্বলা ঘর থেকে বেরিয়ে এল। শেফালির

কথা তার মনে পড়ল। যাবার আগে শেফালির কাছ থেকে বিদায় নেবার জন্ম সে ওপাশে শেফালির ঘরে ঢুকল।

ঘরে শেফালি নেই!

জানালায় এসে দাঁড়াতেই, উজ্জলা দেখতে পেল, নিশান হাতে নিয়ে শেফালি বেদীর দিকে ছুটছে। আর তাকে ধরবার জন্ম, পিছু পিছু পাঁচু চলেছে।

উজ্জলা আর দাঁড়াল না। দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এল। রাস্তা ও ফুটপাথ তখনো জনমানবহীন। উজ্জলা খিড়কী দরজা দিয়ে পার্কে প্রবেশ করে দেয়ালে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রইল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সবই সে দেখল।

নিশানসুদ্ধ শেফালিকে বেদীর উপর রেখে পাঁচু যখন পালিয়ে গেল, উজ্জলার আর বুঝতে বাকী রইল না, শেফালির জীবন প্রদীপ নিভে এসেছে।

কাজের কথা সব ভুলে ছুটে গেল সে বেদীর দিকে। শেফালির বুকে ও মাথায় হাত রাখল। ঠাণ্ডা, হিম শীতল। মৃত শেফালির হাতে তখনো পতাকাটা রয়েছে।

শেফালিকে সে যে কত ভালবাসত—আজ এই প্রথম জানল উজ্জলা। শোকে তার বুক ফেটে যেতে লাগল। শেফালিকে বেদীতে হেলান দিয়ে ভাল করে বসিয়ে রেখে, সে যেন্ গেটের দিকে হাঁটতে লাগল।

ল্যাম্প পোস্টের আড়ালে পাঁচুকে যেন সে এই প্রথম দেখতে পেল। বললে, পাঁচুবাবু যে!

পাঁচু বললে; এখানে কোথায়? পার্কে নিশান তুলতে এসেছেন বুঝি? বলা বাহুল্য, উজ্জলাকে সে এতক্ষণ লক্ষ্য করেনি।

পাগল! উজ্জলা বললে; ওসবের ভেতর আমি নেই মশায়।

তা জানি। পাঁচু বললে; তবু মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়—

উজ্জ্বলা বললে ; তা যদি বলেন প্রতি মুহূর্ত্তে মানুষের ভাবধারার পরিবর্ত্তন হচ্ছে। আজ যে সংসারী কাল সে ঘোর বিপ্লবী। কিন্তু আমাকে সন্দেহ করবার আছে কি পাঁচুবাবু !

শ্যামলবাবুকে, কথা ঘুরিয়ে পাঁচু বললে, অজ্ঞান অবস্থায় হাঁসপাতালে নিয়ে গেছে। জানেন বোধ হয় ?

উজ্জ্বলার মুখে ভয় ও দুশ্চিন্তার ছায়া পড়ল।

ভয় পাবেন না, উজ্জ্বলাদেবী। পাঁচু তার মুখের ভাব লক্ষ্য করে বললে ; লাঠির ঘায়ে রাজবন্দীরা মরেনা।

তাই বলুন। উজ্জ্বলা বললে।

কথা বলতে বলতে তারা মাধবীলতার কুঞ্জের পাশে এসে পড়েছে। পেছনে হাত তিনেক দূরে পার্কের উঁচু দেয়াল। উজ্জ্বলা থমকে দাঁড়াল। ব্যাগ থেকে রিভলবারটা খুলবার সুযোগ খুঁজতে লাগল সে।

পাঁচু বললে ; আচ্ছা বলুন ত,—ঐ ছোট মেয়েটা আপনাদের বাড়ী থাকে না ?

উজ্জ্বলা পাশ ফিরে ভ্যানিটী ব্যাগ খুলতে লাগল। ব্যাগ থেকে প্রথমে সে একখানি ছোট আয়না বার করে মুখখানি দেখে নিল। তারপর পাউডার পাফ্ দিয়ে মুখের ঘাম মুছে নিল।

কার কথা বলছেন ? উজ্জ্বলা বললে।

পাঁচু তাকে ইসারা করে বেদীটা দেখিয়ে দিল। বললে, ঐ যে। দেখুন ত মেয়েটার কি সাহস ! আজকের দিনে কিনা নিশান হাতে করে সে ওখানে বসে আছে !

কথা বলতে বলতে পাশ ফিরে উজ্জ্বলার দিকে তাকাতেই তার চক্ষুস্থির হয়ে এল। আত্মসমর্পণের ভঙ্গীতে যন্ত্রচালিতের মত হাত দুখানি উপরে উঠে এল তার !

উজ্জ্বলা পাঁচুর বুক লক্ষ্য করে রিভলবার ধরেছে। তার চোখ থেকে

আগুন ঠিকরে পড়ছে! বললে, গলা টিপে মেরে এখন কে ঐ মেয়েটী জানতে চাও?

পাঁচু ঢোঁক গিলে বললে, না না, আমি গলা টিপে মারিনি, বিশ্বাস করুন, আমি ওকে গলা টিপে মারিনি। ওর হাত থেকে নিশানটা কেড়ে নিতে চেয়েছিলাম শুধু।

কিন্তু কেন? উজ্জ্বলা প্রশ্ন করে।

পাঁচু উত্তর খুঁজে পায় না। উজ্জ্বলা বলে, সেদিনের কথা মনে পড়ে?

পাঁচুর চোখ বসে গেছে। গলা শুকিয়ে কাঠ। জিভ দিয়ে সে ঠোঁট চাটছে। একটু একটু করে উজ্জ্বলা তাকে পিছিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। মনে পড়ে সেদিনের কথা? উজ্জ্বলা আবার বললে।

বিভ্রান্তের মত পাঁচু মাথা নাড়ল।

উজ্জ্বলা বলতে লাগল; সেদিন শ্যামল বাবুই তোমাকে বাঁচিয়ে ছিলেন। আজ তুমি জগতে শ্যামলর সবচেয়ে যে প্রিয়, তাকে হত্যা করে তার চূড়ান্ত শোধ দিয়েছ।

পাঁচু দেয়ালে হেলান দিয়ে দিশেহারার মত বললে, বিশ্বাস করুন আমি ওকে মারিনি। ঈশ্বরের দোহাই আমি ওকে মারিনি।

উজ্জ্বলা বললে, না, তুমি মারনি।

পাঁচু যেন ডুব জলে তৃণখণ্ড আশ্রয় পেল। আঁকড়ে ধরার স্বরে বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি নির্দোষ। ভগবান জানেন আমি নির্দোষ।

উজ্জ্বলা আগের কথার জের টেনে বলতে লাগল; কিন্তু শেফালির মৃত্যুর জন্ত ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদ দায়ী। আর তুমি সেই সাম্রাজ্যবাদেরই অনুচর। তোমার শাস্তি মৃত্যু।

—না না! দুহাতে কান চেপে ধরল পাঁচু। যেন একথাটা শুনবার সামর্থ্যও তার নেই। চোখের কোণ বেয়ে অশ্রুধারা ছুটল তার। আমায়

বাঁচতে দিন, আমায় বাঁচতে দিন! মিনতিমাখা স্বরে সে বলতে লাগল; আপনার পায়ে পড়ি, আমায় বাঁচতে দিন! দয়া করুন, দয়া করুন!

দয়া! উজ্জ্বলা শান্তস্বরে বললে, দয়া তোমাকে একদিন করা হয়েছিল। কিন্তু আর নয়। তুমি দয়ারও অযোগ্য।

পরক্ষণেই পাঁচুর মৃতদেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

উজ্জ্বলা বেদীর দিকে ফিরে তাকাল। ষ্টেচুতে হেলান দিয়ে নিশান হাতে করে বসে আছে শেফালি। কে বলবে, শেফালি মৃত। না, শেফালি মরেনি। কখনো সে মরবে না।

জাতীয় পতাকার সম্মান রক্ষা করে শেফালি অমরত্ব অর্জ্জন করেছে।

দূরে রাস্তায় পুলিশের সাইরেন। সঙ্গে সঙ্গেই মেসিনগানের শব্দ। পুলিশট্রাক ও সাইরেনের শব্দ ক্রমশ এগিয়ে আসছে। উজ্জ্বলা বেদীর দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

* * * *

প্রথম ভোরের আলো জানালা দিয়ে ঘরের ভেতর এসে পড়ছে। খাটিয়ায় উঠে বসে শ্যামল। রাত্রিশেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নীচে রাস্তায় জনতার জয়ধ্বনি ও আনন্দোল্লাস শতগুণ বেড়ে গেল।

আস্তে আস্তে শ্যামল বারান্দায় বেরিয়ে এল। নিশানোৎসবে বিশাল এক জনতা পার্কে এসে সমবেত হয়েছে। এত ভীড় যে, পার্কে আর পা ফেলবার যায়গা নেই।

বেদীর একপাশে একটী উঁচু মঞ্চ করা হয়েছে। পতাকা তোলবার পর দেশ নায়কেরা এই মঞ্চে উঠে বক্তৃতা করবেন। সেই বিশাল জনসমুদ্রের দিকে তাকিয়ে এক মুহূর্ত্ত শ্যামল বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইল।

তারপর ? তারপরের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত।

উজ্জ্বলার সঙ্গে শ্যামলের আর দেখা হয়নি। একশ চুয়াল্লিশ্ ধারা অমান্য করার অপরাধে শ্যামলের এক বছর জেল হয়েছিল। জেল থেকে বেরিয়ে আসার আগেই খবরটা সে পেয়েছিল, উজ্জ্বলা জেল হাঁসপাতালে মারা গেছে।

আজকের এই নিশানোৎসবে, পার্কের জনসমুদ্রের দিকে তাকিয়ে মনে হয়, শেফালি যেন আজো নিশান হাতে বেদীর উপর বসে আছে। ছোট মেয়ে শেফালি !....

সহসা তার চোখে ধাঁধা লেগে যায়। শেফালিকে সে সত্যি সত্যিই বেদীর উপর দেখতে পাচ্ছে। হ্যাঁ, শেফালি। শেফালি বই কি। নিশান হাতে শেফালি আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায়।

দাদাবাবু ! শ্যামলের চোখের ধাঁধা টুটে যায়। বৈকুণ্ঠ চা নিয়ে এসেছে। শেফালি ও উজ্জ্বলার কথা, জেল থেকে ফিরে এসে শ্যামল বৈকুণ্ঠর মুখেই শুনেছিল।

তুই কখন ফিরে এলি ? শ্যামল চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বললে।

অনেকক্ষণ। বৈকুণ্ঠ বললে, কিন্তু এক্ষুণি আবার বেরিয়ে যাচ্ছি। লাটের বাড়ীতে জাতীয় পতাকা উড়বে, দেখতে যাব।

শ্যামল ঘরে ফিরে এসে খাটিয়ায় বসল।

'স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার।' নীচে, রাস্তা থেকে জয়ধ্বনি ভেসে আসছে। হ্যাঁ, বিপ্লবীরা এই স্বপ্নই চিরকাল দেখেছে। মানুষের জন্মগত অধিকার—সাম্য ও স্বাধীনতার স্বপ্ন। এ স্বাধীনতা কোন ব্যক্তি বা দল বিশেষের স্বাধীনতা নয়—এ স্বাধীনতা জনসাধারণের,

চল্লিশ কোটী ভারতবাসীর। বিদেশী শাসক এ-দেশ ছেড়ে কাল রাতে চলে গেছে, কিন্তু দেশী শোষক জাতীয়তাবাদের ছদ্মবেশ পরে তাদের পরিত্যক্ত গদী চেপে বসে, জনসাধারণকে যেন না বিভ্রান্ত করে, কামনা। শত শত শহীদের রক্ত যে স্বাধীনতা এনে দিয়েছে, তা সত্যি সত্যিই জনসাধারণের স্বাধীনতা হয়। জীবিকা অর্জ্জনের স্বাধীনতা, মানুষের মত সুষ্ঠুভাবে বেঁচে থাকার স্বাধীনতা, যেন আমরা সত্যি সত্যি লাভ করি। শুধু তাই নয়, আমাদের চিন্তার স্বাধীনতাও যেন কোন রাজনৈতিক দল গায়ের জোরে হরণ না করে।....

শেফালি ও উজ্জ্বলার মত অজ্ঞাত অখ্যাত শত শত বীর শহীদের স্মৃতি মাখা, চল্লিশকোটী ভারতবাসীর আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক এই নিশান। আজকের এই নিশানোৎসব, শুধু ভারতবাসীরই নয়—মুক্তিকামী বিশ্ববাসীর

স্বাধীনতার রঙে রঙীন, আজকের নবীন প্রভাতে, শ্যামল এই কামনা করে, চল্লিশকোটী ভারতবাসীর এ-নিশান যেন চিরদিন দুনিয়ার মানুষের স্বাধীনতার প্রতীক হয়ে থাকে।
